হিচ হাইকার

অরুণ কুমার মজুমদার

॥ পরিবেশক ॥
মৌসুমী প্রকাশনী ॥ ১এ, কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

প্রকাশকাল :
আষাঢ়, ১৩৬৫

প্রকাশিকা :
তাপসী সেনগুপ্ত
কস্‌মো-ক্রীপ্ট্‌
১১, নিতাইবাবু লেন
কলকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীসাধনকুমার গুপ্ত
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিন্টিং
২১/বি, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৬

এই লেখকের অন্যান্য অ্যাডাল্ট থ্রিলার :

ডামি

দহনে বিষ দহনে বড় জ্বালা

রত্না খুন হলো

এল কাহিরা ১

এয়ার ইণ্ডিয়ার সেভেন-জিরো-সেভেন জেট প্লেনটা তখন বম্বের এয়ার পোর্ট ছেড়ে আরব সাগরের ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে। সুদূর মিশরের রাজধানী কায়রো এখন ওর গন্তব্য স্থান।

প্লেনের ভেতর প্রায় একশ জনের মত দেশী বিদেশী যাত্রী। বেশির ভাগই ভারতীয়। বাকি কয়েকজন আমেরিকান, ইয়োরোপীয়ান ও আরব দেশের লোক। এদের মধ্যে ষোল বছরের তরুণ গৌতমও বসে। গৌতম আপাতত কায়রো যাচ্ছে। নিজের সীটে বসে এখন সে প্লেনের জানলা দিয়ে আরব সাগরের জল দেখতে ব্যস্ত। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য। ওর চিরকালের প্রিয় জানলার পাশের সীট এই প্লেনে উঠে সে পায়নি। প্লেনের এম্বার্কেশন কার্ড অনুযায়ী ও পেয়েছে জানলার দিক থেকে একেবারে তৃতীয় সীট। গৌতমের মন তাই একটু ক্ষুণ্ণ। বাইরের দৃশ্য তেমন কিছুই সে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না। ওর সঙ্গী যাত্রী দুজন বোধহয় আমেরিকান। পাশেরটি যুবক, বই পড়ায় ব্যস্ত। আর একজন মধ্যবয়েসী পত্রিকায় ডুবে।

—হ্যালো মাষ্টার, শরীর ভাল তো?

গৌতম দৃষ্টি ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকাল। ঝলমলে নাকছাবি পরা এয়ার হোষ্টেস ভদ্রমহিলাটি পাশের রোয়ে এক যাত্রীকে কিছু দিতে এসে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন। গৌতম ঘাড় নেড়ে ওর ইংরেজী প্রশ্নের উত্তর ইংরেজীতেই দিল, হ্যাঁ ভাল আছি ধন্যবাদ।

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। গৌতমের একটু লজ্জা হল। কিছুক্ষণ আগে প্লেনটা যখন দিল্লী থেকে আকাশে ওড়ে তখন হঠাৎ সে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। মাথা ঘোরার সঙ্গে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল সে। তখন এই এয়ার হোষ্টেস মহিলাটি ওর কাছে ছুটে এসেছিলেন। জল বালিশ

বা ওষুধপত্র কিছু চাই কি না তু-একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। অবশ্য গৌতমের শেষ পর্যন্ত কিছুই প্রয়োজন হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেছে। প্লেনটা দিল্লী থেকে উড়ে বম্বেতে এসে নামল। যদিও বম্বে আসার কথা এর ছিল না। শিডিউল অনুযায়ী দিল্লীর পরের ষ্টপই কায়রো। কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে নাকি পথের এই পরিবর্তন।

গৌতম আবার জানলার দিকে মুখ ফেরাল। ফ্লাইট ক্যাপ্টেন একটু আগে ঘোষণা করেছেন প্লেন এখন টানা প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা উড়ে চলবে। বম্বে থেকে কায়রোর আকাশপথে দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার। এই প্লেনের গতি এখন ঘণ্টায় প্রায় ন'শ কিলোমিটার। সঙ্গী যাত্রী তুজনকে পেরিয়ে গৌতমের দৃষ্টি কোনমতে জানলার ডিম্বাকৃতি কাঁচের ভেতর একটুকরো নীল সমুদ্রকে ধরতে পারল। সেইদিকে তাকিয়ে গৌতম ভাবতে লাগল দিল্লীতে প্লেনে উঠে হঠাৎ সে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কেন। প্লেনে তো এর আগেও কয়েকবার উঠেছে সে। কিন্তু এরকম তো কোনোবারই হয়নি। তাহলে কি বাড়ির চিন্তাই ওকে তখন তুর্বল করে ফেলেছিল?

কথাটা ঠিক। গৌতম ভেবে দেখল। এত মনের জোর এত সাহস থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু শেষ মুহূর্তে দিল্লী এয়ারপোর্টে এসে একটু যেন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। তখন প্লেনে ওঠার সময় মার কাতর মুখটাই থেকে থেকে ভেসে উঠছিল মনে। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে দিল্লীর জন্য ট্রেনে ওকে বিদায় দিতে এসে মা সেই কাতর মুখে বারবার তাকিয়ে ছিল ওর দিকে।

ভাবতে ভাবতে একটু শক্ত হয়ে বসল গৌতম। সফরের শুরুতেই মন এরকম তুর্বল হয়ে গেলে চলবে না। সামনে রয়েছে বিশাল অভিযান। দীর্ঘ অজানা পথের একাকী যাত্রী সে। ওর সম্বল বলতে সামান্য একশ ডলার আর সাহস। এই সাহসটুকুই আসল।

তা নাহলে ওর মত বয়েসের ছেলে সম্পূর্ণ একা এই অল্প পুঁজি নিয়ে এত বড় অভিযান শেষ করতে পারবে না।

বাইরের নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রের খেলা দেখতে দেখতে নিজেকে অচিরেই হারিয়ে ফেলল গৌতম। বাড়ির চিন্তা দূরে সরিয়ে সেই অনন্ত দৃশ্যের মধ্যে এবার সে ডুব দিল। গৌতমের এতেই আনন্দ। এটাই ওর কাছে একটা বিরাট নেশা। সুদূরের টানে বেরিয়ে পথের দুপাশের সব কিছু ওর কাছে সুন্দর মনোরম। অজানা সমুদ্র, নদী-পাহাড়, শহর মানুষ দেখতে দেখতে সে এক অপরূপ রোমাঞ্চ বোধ করে। এই রোমাঞ্চের আকর্ষণেই সে আজ সাত সমুদ্র পেরিয়ে ইয়োরোপের দিকে ছুটে চলেছে।

তবে হ্যাঁ, ঐ টুকু ছেলে সম্পূর্ণ একা এই অভিযানে বেরুলো কি করে সেটা নিশ্চয়ই একটা বিস্ময়কর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব জানতে হলে গৌতমের বাবার পরিচয়টাই এখানে প্রথম দরকার।

গৌতমের বাবা হলেন শিলিগুড়ির নিখিলেশ মজুমদার। ভদ্রলোক বিগত দিনের একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক। তিনি তাঁর যৌবনকালে সারা ভারতবর্ষ সাইকেলে চষে বেরিয়েছিলেন। অতএব তাঁর ছেলেও যে একজন সাংঘাতিক ভ্রমণ-পিপাসু হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। গৌতম এর মধ্যেই ওর বাবার সাথে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখেছে। দেখা মানে শুধু কাশ্মীর কন্যাকুমারী নয়, তার সঙ্গে অরুণাচল আন্দামানের মত দুরূহ জায়গাগুলোও ওর ঘোরা। তাছাড়া গত বছর শিলিগুড়ির একটা এক্সপ্লোরার ক্লাবের নেতৃত্বে দার্জিলিং-ফালুট ট্রেকিং ও শিলিগুড়ি-শিলং সাইকেল ট্যুরেও সে অংশ নিয়েছে। বলা বাহুল্য গৌতম এমনিতেই ছোটবেলা থেকে খুব বেপরোয়া। ওর মধ্যে সুদূরের প্রতি টান সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক মাত্রায় বেশি। জীবনের প্রায় শুরুতেই অ্যাডভেঞ্চার ওর সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিখিলেশ বাবুর মত পিতার দৌলতে এ সব ব্যাপারে কখনও সে বাধা পায়নি।

এবারকার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। গৌতম এ বছর হায়ার

সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিল। এই পরীক্ষার তু'মাস আগে নিখিলেশ বাবু বলেছিলেন গৌতম যদি ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাস করে তাহলে তিনি তাকে কলেজে যাওয়ার জন্য একটা মপেড মোটর সাইকেল উপহার দেবেন। গৌতম পড়াশুনায় এমনিতেই ভাল। তার ওপর খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র। সারা বছর ট্যুর ট্রেকিং নিয়ে এত মেতে থাকলেও এদিকে ওর কোন ফাঁকি নেই। তবে এবার উপহারের ঘোষণাটা ওকে আরো সতর্ক ও একাগ্র করে তুলেছিল। এজন্য তু'মাস আগে থেকেই সে পুরো মন-প্রাণ দিয়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

ঠিক তখনই খবরের কাগজে বেরুলো এয়ার ইণ্ডিয়ার একটা মস্ত বড় বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা ছিল তিরিশ বছরের কম বয়েসের ছেলে মেয়েদের জন্য ভারতবর্ষ থেকে প্যারিসের আসা যাওয়ার ভাড়া এখন মাত্র তু হাজার নশ তিরানব্বই টাকা। বিজ্ঞাপনটা দেখে চমকে উঠল গৌতম। একটা মপেড মোটর সাইকেলের দামও প্রায় ঐ রকমই। কিন্তু এত কম খরচে ইয়োরোপ থেকে ঘুরে আসা যায় এ ধারণা ওর মোটেই ছিল না।

ব্যাস তারপর আর কি! বিজ্ঞাপনটা দেখা মাত্র ভ্রমণ-পিপাসু গৌতমের মন চনমন করে উঠল। একটা মপেডের চেয়ে সাগর-পারের হাতছানি ওর কাছে ঢের বেশী আকর্ষণীয়। আর বসে থাকল না সে। পরীক্ষার পড়ার সাথে সাথেই শুরু করে দিল ওর গবেষণা। এ ব্যাপারে ওর এক বন্ধুও জুটে গেল। শিলিগুড়ির এক মিলিটারী অফিসারের ছেলে। ওর সহপাঠী। তুজন মিলে ইয়োরোপ ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা রকমের বই জোগাড় করে, সেই দেশে ঘুরে বেড়াবার আরো সব সস্তার পন্থাগুলো খুঁজে বার করার চেষ্টা করল। কারণ সস্তায় শুধু সেখানকার টিকিট পেলেই তো হবে না। ঐ দেশে থাকা খাওয়ার খরচের ব্যাপারটাও ভেবে দেখতে হবে। গৌতম যতদূর জানে সে খরচ নেহাত কম নয়।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলে অনেক কিছুরই উপায় হয়। উপায় নির্ভর

করে ইচ্ছের শক্তির ওপর। গৌতমের ইচ্ছে-শক্তি ও মনের জোর অপরিসীম।

পরীক্ষা শেষ হল। নিখিলেশবাবু দেখলেন সত্যিই তার ছেলে কঠোর পরিশ্রম করে অসীম অধ্যবসায় নিয়ে পরীক্ষা সমাধা করেছে।

তারপর কথাটা তাঁর কাছে পাড়ল গৌতম। পরীক্ষা শেষের ঠিক পরের দিন সে বাবার কাছে এল।

বাবা তো শুনে অবাক।—কি বললি, ইয়োরোপ যাবি ?

—হ্যাঁ। গৌতম চোখে মুখে দৃঢ়তা এনে বলল, ফার্স্ট ডিভিশনে আমি পাশ করবই। তাই বলছি তুমি যদি আমাকে চার হাজার টাকা দাও তাহলেই আমার ঘোরা হয়ে যায়। মপেড আমার চাই না।

—মাত্র চার হাজার টাকায়! নিখিলেশবাবু বেশ অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, বুঝেছি ঐ এয়ার ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞাপনটা মগজে ঢুকেছে, তাইতো ?

—হ্যাঁ। বিজ্ঞাপনটা তুমি দেখেছ ?

—দেখেছি। কিন্তু তোর চার হাজার টাকার হিসেবটা তো বুঝলাম না।

—কেন ? গৌতম বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, তিন হাজারে প্যারিসের রিটার্ন টিকিট। সাড়ে সাতশ টাকা একশ ডলারের জন্য আর বাকিটা ধরলাম অন্যান্য খরচ।

—দাঁড়া, দাঁড়া। একশ ডলারে তুই কদিন থাকবি সেখানে ?

—অন্তত একমাস। তবে আমার বিশ্বাস ঐ টাকায় আরো কিছু দিন বেশি ঘোরা যাবে।

তারপর যা বলল গৌতম সব শুনে নিখিলেশ বাবু তো থ। এত খবর গৌতম এর মধ্যে যোগাড় করল কি করে ?

গৌতমের পরিকল্পনা মোটামুটি এই। প্রথমে সে ইয়ুথ হোস্টেল এ্যাসোশিয়েশনের মেম্বার হবে। কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবরে ওদের অফিসে গেলে মাত্র ছ টাকায় নাকি এক বছরের মেম্বার হওয়া

যায়। গৌতম ইতিমধ্যে ওদের দিল্লীর অফিস থেকে ইয়ুথ হোস্টেল হ্যাণ্ডবুক আনিয়ে দেখেছে পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় বিশেষ করে ইয়োরোপের প্রতিটি ছোট বড় শহরে এদের হোস্টেল আছে। এই হোস্টেলগুলোতে থাকবার ব্যবস্থা খুব ভাল। ইয়ুথ হোস্টেল মেম্বার শীপ কার্ড দেখালেই নামমাত্র দক্ষিণায় সেখানে থাকা যায়। এই ভাবে ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গায় তিরিশ দিন থাকতে ওর খরচ পড়বে পঁচিশ ডলারের মত। তিরিশ দিন দুবেলা সস্তায় কোথায় খাওয়া যায় তারও সে খোঁজখবর ইয়োরোপ-ট্যুরের একটা বই থেকে পেয়ে গেছে। সেই বই অনুযায়ী ওর তিরিশ দিনের খাবারের জন্য লাগবে মাত্র পঞ্চাশ থেকে ষাট ডলার। একশ ডলারের বাকি টুকু ওর একষ্ট্রা। তার কারণ ইয়োরোপের একটা শহর থেকে আর একটা শহরে গৌতম বিনা পয়সাতেই ঘুরে বেড়াবে। অবশ্য সেই বেড়ানোর পোশাকী নমে হচ্ছে 'হিচ-হাইকিং'। বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন গাড়িতে লিফট নিয়ে এভাবে নাকি হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা বিনা ভাড়ায় বিদেশে ঘুরে বেড়ায়।

সব শুনে ও গৌতমের যোগাড় করা ইয়োরোপ ভ্রমণের ওপর বইগুলো ঘেঁটে নিখিলেশ বাবু ব্যাপারটাকে গুরুত্ব সহকারে ভাবলেন।

তার পরের ঘটনা অল্পই। নিখিলেশবাবু যে অন্য ধাতের মানুষ তা আগেই বলা হয়েছে। মপেডের বদলে ছেলেকে বেড়ানোর জন্য চার হাজার টাকা দিতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তবে একেবারে বিদেশ পাড়ি দেওয়ার কথা শুনে তিনি একটু থমকে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন শুনলেন এ ব্যাপারে সে একেবারে একা নয়, ওর সঙ্গে আরো একজন সমবয়সী বন্ধু রয়েছে, তখন তিনি রাজি হয়ে গেলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাধ সেধেছিলেন গৌতমের মা। বাবা রাজি হলেও মা কিন্তু ঐটুকু ছেলেকে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে যেতে প্রথমে কিছুতেই অনুমতি দিচ্ছিলেন না। তবে সে বাধাও গৌতম কয়েক দিন প্রায় অনশন করেই কাটিয়ে দিল। ছেলের অভিমান ও নিখিলেশবাবুর

অভয়-দানে শেষ পর্যন্ত তিনিও অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। উপায় কি ? ছেলে মন খারাপ করে দিনের পর দিন উপোস করে থাকবে এ তো আর চোখে দেখা যায় না।

কিন্তু এতো করেও কি ওর যাওয়া সহজ হয় ? গৌতমের সব যখন ঠিক সেই মুহূর্তে ওর সেই সঙ্গীটির মা বাবা বেঁকে বসলেন। তারা কিছুতেই তাদের ছেলেকে এই দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে দিতে রাজি নন। গৌতম একটু থমকে গেল। কিন্তু দমল না। শেষ অবধি একাই যাওয়া ঠিক করল। ওর অসীম ইচ্ছে ও প্রস্তুতির সামনে মা বাবাও আর না করতে পারলেন না। অতএব যা ভবিতব্য তাই হল। গৌতম নির্দিষ্ট দিনে ওর তল্পী তল্পা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা যে কি ভাবে কাটল বুঝতেই পারল না গৌতম। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ সেই আকাশ, সমুদ্র, তারপর প্লেনের এলাহী মোগলাই লাঞ্চ। সব শেষে কতগুলো পত্র-পত্রিকা নিয়ে সময়টা বেশ বয়ে গেল।

চারটে বাজতে দশে প্লেনের মাইকে হঠাৎ শোনা গেল বেল্ট বাঁধার নির্দেশ। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা কায়রো এয়ার পোর্টে নামছে। গৌতমের বুকে একটা শিহরণ খেলে গেল। কায়রো! অর্থাৎ সেই বিচিত্র দেশ মিশর। যার পিরামিড, স্ফিংক্স্ ও মমির কথা কবে থেকে শুনে এসেছে সে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই দেশে পা রাখতে চলেছে গৌতম। এটা কম উত্তেজনার কথা ? কোমরের বেল্টটা বেঁধে জানলার দিকে তাকালো সে। বহুক্ষণ আগে পর্যন্ত সমুদ্রের নীল ছবি ঝুলছিল সেখানে। তারপর হলদে মরুভূমি। এখন হঠাৎ নজরে পড়ল সেই হলুদের মাঝে আঁকা বাঁকা কালো সুতোর মত একটি রেখা। ওটাই বোধহয় নীল। এবার গোঁ গোঁ শব্দ করে প্লেনটা নীচে নামতে শুরু করল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মাটি। তীব্র বেগে ছুটে তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কোমরের বেল্ট খুলে সীট ছেড়ে উঠল গৌতম। হ্যাট-র‍্যাক থেকে

ওর শান্তিনিকেতনী পোর্টফোলিও ব্যাগটা নামিয়ে সবার সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে চলল। এই আন্তর্জাতিক প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা ওর এই প্রথম। তাই ধীরে সুস্থে বুঝে-সুঝে এখানে ওকে চলাফেরা করতে হবে।

নীচে নেমে গৌতম দেখল ওদের জন্য তুরকম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা ট্রান্‌জিট প্যাসেঞ্জারদের জন্য। অর্থাৎ যারা কায়রোর পরের কোন স্টপের যাত্রী। তারা লাউঞ্জে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার প্লেনে উঠবে। আর দ্বিতীয় গাড়ি হল যারা কায়রোর যাত্রী শুধু তাদেরই জন্য। গৌতম সেই গাড়িতেই চড়ল।

গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই পাসপোর্ট পরীক্ষা। তারপর হেলথ চেকিং। এ তুটোর জন্য অবশ্য বিশেষ সময় লাগল না। কারণ এ ব্যাপারে গৌতমের কোন ত্রুটি ছিল না। পাসপোর্ট অধিকারী সে বছর তুয়েক আগে থেকেই। বাবার সঙ্গে আন্দামান যাওয়ার সময় ওটা ওকে করাতে হয়েছে। তার কারণ আন্দামানের প্লেন রেঙ্গুন হয়ে যায়। এবার ওকে শিলিগুড়ি কলকাতা ছুটোছুটি করে শুধু ভিসাগুলোই যোগাড় করতে হয়েছিল। ভিসা অর্থাৎ পাসপোর্টের ওপর বিদেশী রাষ্ট্রে ঢোকার অনুমতি পত্র। কলকাতায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে গিয়ে গৌতম ওর এক মেসোমশাইয়ের সাহায্যে নিজেই সেগুলো সংগ্রহ করেছে। অবশ্য মিশরের দূতাবাস কলকাতায় নেই। নেই সুইজারল্যাণ্ড অস্ট্রিয়ার মতো আরো কয়েকটি দেশেরও। এগুলোর জন্য ওকে দিল্লীতে কয়েকদিন আগেই আসতে হয়েছিল। তাছাড়া বিদেশে ঢোকার প্রয়োজনীয় কলেরা বসন্তের টিকা নেওয়ার ইন্টারন্যাশানাল হেলথ সার্টিফিকেটও সে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছে।

কিন্তু এ সবের পর কাস্টম চেকিংটাই ওর কাছে বড় যাতনাময় ও ভয়াবহ মনে হল। শান্তিনিকেতনী পোর্টফোলিও ব্যাগ ছাড়া ওর সঙ্গে ছিল একটা ক্যানভাসের রুকস্যাক। ব্যাগেজ ক্লেম কাউণ্টার থেকে রুকস্যাকটা নিয়ে কাস্টম অফিসারের সামনে যেতেই তারা ওকে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে একগাদা প্রশ্ন করল। তারমধ্যে কয়েকটার উত্তর দিল

সে বাকিগুলো, বুঝতেই পারল না। তখন ওরা রুকস্যাক ও ব্যাগটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে তারপর ছাড়ল।

লাইনে দাঁড়িয়ে বিদেশে ঢোকার এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পরিত্রাণ পেতে লাগল প্রায় দেড় ঘণ্টা। এরপর গৌতমের প্রথম কাজ এখানকার খরচের জন্য কিছু মিশরীয় মুদ্রা যোগাড় করা। দিল্লী এয়ারপোর্টে ওঠার আগে ভারতীয় নিয়ম অনুযায়ী গৌতম ষাট টাকার মত পাল্টে আট ডলার পেয়েছিল। এ ছাড়া ওর কাছে রয়েছে অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কের কুড়ি ডলারের পাঁচটা ট্রাভেলার্স-চেক। এই একশ ডলার ও কলকাতাতেই এয়ার ইণ্ডিয়ার রিটার্ন টিকিট কাটার দরুণ কিনতে পেরেছে। কিন্তু চেকগুলোকে এখন সে ভাঙাতে চায় না। এই দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা খরচের ব্যাপারে ওকে যে এখন থেকে খুব সতর্ক হতে হবে এ ব্যপারে সে সজাগ। তাই পকেটের আট ডলার ভাঙানোর জন্যই গৌতম সামনের মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর ট্যুরিস্ট অফিস। সেখান থেকে কায়রোর ভালো একটা ম্যাপ ও আরো কয়েকটা খবরাখবর নিয়ে গৌতম ইয়ুথ হোস্টেলের কথাটা জিজ্ঞেস করল। কাউন্টারের একজন ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন বাইরে তাহরির স্কোয়ারের বাস পাবে তাতে চলে যাও।

কায়রোর ইয়ুথ হোস্টেলটা তিন তলা একটা বাড়ি। প্রায় দশ মাইলের মতো পথ পেরিয়ে মেন বাস-ষ্ট্যাণ্ডে নেমে কয়েকজনকে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করতে করতে সেখানে গিয়ে পৌছল গৌতম। অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজে হল না। তার কারণ গৌতম রাস্তায় বেরিয়ে দেখল ইংরেজী ভাষাটা এখানে প্রায় অচল। এয়ারপোর্টে ইংরাজী কয়েকজন বলতে পারলেও আসলে সর্বসাধারণ আরবী ছাড়া কিছুই জানে না। ভাগ্যিস ওর কাছে ইয়ুথ হোস্টেলের হ্যাণ্ডবুকটা ছিল। তা থেকে শুধু ঠিকানাটা বের করে দু-এক জনকে কয়েকবার বলতেই বাড়িটা তারা দেখিয়ে দিল।

একজন মোটা মত মিশরীয় ভদ্রলোক সে বাড়ির একতলার অফিস ঘরে বসে লেখার কিছু কাজ করছিলেন। গৌতম ওর ব্যাগ থেকে ইয়ুথ হোস্টেল মেম্বারশীপ কার্ডটা বের করে তাকেই দেখাল।—আমি একদিন থাকতে চাই এখানে।

ভদ্রলোক কার্ডটার ওপর তারিখ ও সীল মেরে ওর কাছ থেকে আধ ডলারের সমান কয়েক পিয়াস্ত্রে পয়সা নিয়ে ইংরেজীতে বললেন, দোতলায় চোদ্দ নম্বর বেড।

গৌতম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দোতলার নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে দেখল, ট্রেনের টু-টায়ার বগীর মত তিন পাশে তিনটে খাট। অর্থাৎ মোট ছটা বেড। একটা খাটের একতলায় একটি ছেলে ঘুমোচ্ছে। জাপানী বোধ হয়। আর একটির দোতলায় খালি গায়ে বসে লাল টুকটুকে এক তরুণ। গৌতমের চোদ্দ নম্বর বেডটাও ওপরে। রুকস্যাকটা সেই বেডের ওপর রেখে গৌতম এবার একতলার খালি বিছানাটার ওপর ধপ করে বসে পড়ল। যাক এতক্ষণে সত্যিই একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। টানা ছঘণ্টা বদ্ধ প্লেনের একঘেয়ে যাত্রার পর এয়ারপোর্টের এত ঝক্কি পেরিয়ে নির্বিঘ্নে বিদেশী শহরে ঢোকার যে কি রোমাঞ্চকর আনন্দ সেটা এখন সে অনুভব করতে পারছে।

—ডু ইয়ু স্পিক ইংলিশ ?

গৌতম তাকাল। সেই ফর্সা ছেলেটি ওর দিকে মুখ করেই প্রশ্নটা করছে।

—হ্যাঁ পারি। জবাব দিল সে।

—কোথা থেকে আসছ ?

—ইণ্ডিয়া। তুমি ?

—আমি অ্যামেরিকান। আসছি এখন ইটালী থেকে। তুমি আরবীও বলতে পার নাকি ?

—না। মাথা নাড়ল গৌতম।

ছেলেটি হাসল এবার। —তার মানে আমারই মত অবস্থা।

—কেন কি হল তোমার ?

—ধুত! ইংরেজী এখানে কেউ বোঝে না। একটু আগে বেরিয়ে ছিলাম। দেখলাম জিজ্ঞেস করলে কেউ কিছু বলতে পারে না।

গৌতম একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, ইটালীতে কি ইংরেজী চলে?

—না। ঘাড় নাড়ল সে। কিন্তু ইটালীয়ান লেখাগুলো ইংরেজী হরফে বলে খুব একটা অসুবিধে হয় না। এখানে সব আরবী। পড়তে গেলেও তুমি কিছু বুঝতে পারবে না। বলেও বোঝাতে পারবে না।

গৌতম কিছুক্ষণ জিরিয়ে খাট থেকে নামল। ঘরের বাইরে এসে বাথরুমের খোঁজে তাকাল এদিক ওদিক। যা গরম, এখন একটু চান না করে উপায় নেই! তার পর বাড়িতে একটা চিঠি লিখে বেরোতে হবে। এর মধ্যে খিদেও পেয়েছে খুব। প্লেনের সেই দুপুরে খাওয়ার পর পেটে আর কিছুই পড়েনি।

কায়রো শহরের কর্ম চঞ্চল অংশের নাম তাহরির স্কোয়ার। অর্থাৎ কলকাতার যেমন এসপ্লানেড। এর চারপাশে বড় বড় সব প্রাসাদ, মিউজিয়াম, কিউরিওর দোকান, কাফে আর নানা রকম যানবাহনের ভিড়। ইয়ুথ হোস্টেলটা এরই কাছাকাছি। গৌতম সন্ধের সময় হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এলাকাটা চক্কর দিতে দিতেই ওর খাবার জায়গার সন্ধান করতে লাগল। খাবার জায়গা বলতে কোন রেষ্টুরেণ্টের কথা সে ভাবছিল না। ওসব জায়গায় ঢোকার মত পয়সা ওর কাছে নেই। তাছাড়া দুপুরের মহারাজা-খানার পর এখন আর চব্য-চূষ্য খাওয়ার ইচ্ছেও নেই। মোটামুটি পেট ভরলেই হল।

খুঁজতে খুঁজতে মেন বাস ষ্ট্যাণ্ডের পাশে একটা ষ্টল ওব নজরে পড়ল। কিন্তু গৌতম দোকানটার কাছে গিয়ে দেখল সেখানে কেক বিস্কুট ছাড়া আর কিছুই নেই। আর একটু এগিয়ে গেল সে। আলোর এলাকাটা ছেড়ে একটা অন্ধকার অন্ধকার জায়গায় আসতেই ও লক্ষ্য করল একটা লোক কলকাতার ময়দান ভিক্টোরিয়া অঞ্চলের মত ছোট্ট ঠেলাগাড়ি সাজিয়ে কি যেন বিক্রি করছে। তাকে ঘিরে চার পাঁচজন ক্রেতা, প্রত্যেকেই হাতে প্লেট নিয়ে কিছু

খেতে ব্যস্ত। গৌতম উঁকি মেরে দেখল। গোল গোল রুটিই বোধহয় ওগুলো। তার সঙ্গে মাংস। বাঃ এ রকম কিছুই তো খুঁজছে সে। কিন্তু মাংসটা কিসের? উটের না গরুর? একবার জানতে হবে।

গৌতমকে এগোতে দেখেই চারপাশের লোকগুলো সরে দাঁড়াল। গৌতম গাড়ির উনোনের ওপর বসান গরম মাংসের পাত্রটা দেখিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল ব্যাপারটা। কিন্তু সে গৌতমের কথা এক বর্ণও বুঝতে পারল না। আশে পাশের লোকগুলো তখন আরবী ভাষায় গৌতমকে জিজ্ঞেস করল, কি জানতে চায় সে। গৌতম এবার ইশারায় ওদের প্রশ্নটা করল। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। এ ধরনের আকার ইঙ্গিত ও ইংরেজী আরবীর যখন পরস্পরে ঠোকাঠুকি হচ্ছে তখন হঠাৎ পেছন থেকে স্পষ্ট ইংরেজীতে কে যেন বলে উঠল, মিষ্টার, আমি কি তোমায় সাহায্য করতে পারি?

গৌতম অথৈ অন্ধকারে যেন আলোর আভাস পেল। পেছন ফিরে দেখল সুবেশী সুন্দর একজন মধ্য বয়েসী ভদ্রলোক। তাঁকে একটু আগে কিন্তু এই ক্রেতাদের মধ্যে সে দেখেনি। তবে যাই হোক ওকে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল গৌতম। জিজ্ঞেস করল, আপনি ইংরেজী বলতে পারেন?

—হ্যাঁ। আমি এখানকার লোক হলেও ইংরেজী ভালোই জানি। তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে? ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

—এই মাংসটা কিসের আমি জানতে চাই।

—কেন, তুমি কি এখানে খাবে নাকি?

—তাইতো ভাবছি।

—শোন, এদিকে এসো।

ভদ্রলোকের অর্থপূর্ণ ডাক শুনে গৌতম সরে এল। ওকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বড় রাস্তায় এলেন। —তুমি কোথা থেকে আসছ?

—ইণ্ডিয়া। গৌতম উত্তর দিল।

—তোমার নাম?

—গৌতম মজুমদার।

—তার মানে তুমি হিন্দী জান। বলেই ভদ্রলোক গৌতমকে একেবারে চমকে দিয়ে ইংরেজী ছেড়ে চোস্ত হিন্দীতে বললেন, তুমি এ রকম জায়গায় খেতে এসেছ কেন? এই নোংরা খাবার কি তোমার খাওয়া উচিত?

গৌতম হকচকিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাল। তিনি যে মিশরীয় তা চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কায়রোর রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার মুখে হিন্দী শুনে সে হতবাক, আপনি হিন্দীও জানেন!

—হ্যাঁ খুব ভালোই জানি। আমি ইণ্ডিয়াতে বেশ কয়েক বছর ছিলাম। ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, তুমি এস আমার সঙ্গে।

—কোথায়? গৌতমও এবার হিন্দী আওড়াল।

—কেন, খাবে না? চল তোমাকে একটা ভালো খাবার জায়গা দেখিয়ে দিই।

গৌতম ঢোক গিলল। ভালো খাবার মানেই যে রেষ্টুরেণ্ট তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তার খরচটা! একটু আমতা আমতা করে বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আর কোথাও যেতে চাই না। এ ধরনের জায়গায় খাবার অভ্যেস আমার আছে। আপনি তো ইণ্ডিয়াতে ছিলেন। এ রকম খাবার সেখানেও ফেরিওয়ালারা বিক্রী করে, দেখেন নি?

—দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে এর তুলনা কোরো না। তুমি কি ঐ মাংস খেতে পারবে ভেবেছ? কক্ষনো না। ওটা খেলেই তোমার বমি হয়ে যাবে।

—কেন ওটা কিসের মাংস?

—কিসের, আমিও জানি না। তবে ভালো কিছুর নয় এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাছাড়া ঐ রান্না তোমার মুখে কিছুতেই রুচবে না। ভদ্রলোক এবার ঝুঁকে গৌতমের চোখের কোণে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—বুঝেছি, তুমি খরচের কথা ভাবছ। আরে না না, তা মোটেই নয়। আমি জানি তোমাদের ট্যুরিস্টদের কাছে বেশি পয়সা থাকে না। আমি তোমাকে সস্তার দোকানেই নিয়ে যাব। চলে এস।

আর বলার কিছুই নেই। গৌতম তার সঙ্গ নিল।

ভদ্রলোক ওকে নিয়ে ফুটপাতের ধার ঘেঁসে চলতে শুরু করলেন। পথে যেতে যেতে তার টুকটাক প্রশ্ন। এখানে কোথায় উঠেছে গৌতম। কতদিন থাকবে। এরপর কোথায় ওর যাওয়ার কথা। ভারতবর্ষে ও কি করে। সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল গৌতম।

কথা বলতে বলতে ওরা তখন একটা গলির মুখে এসে পড়েছে। ভদ্রলোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে চট করে চারপাশটা ভাল করে দেখে গৌতমকে নিয়ে সেই গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

গলিটা পুরোপুরি নির্জন। দুপাশে উঁচু উঁচু সব বাড়ি। তার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে গৌতমের বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁক করে উঠল। হাজার হোক এটা একটা নতুন দেশ। এখানকার পথ-ঘাট ভাষা কিছুই জানে না সে। এখানে এভাবে একজন অপরিচিতের কথায় সায় দিয়ে কোথাও যাওয়াটা কি ঠিক? গৌতমের একটু ভয় ভয় করতে লাগল। সময়টা রাত্তির বলেই আরো চিন্তা। কিন্তু এ মুহূর্তে করার কিছুই নেই। ও শুধু সতর্ক হয়ে চারপাশে নজর রেখে ভদ্রলোককে অনুসরণ করতে লাগল।

গলিটা বাঁক নিয়ে শেষ হল যেখানে সেটা আর একটা বড় রাস্তা। এই রাস্তায় অল্প কিছু লোকের ভিড়। দুপাশে সারি সারি দোকান। দূরে একটা সিনেমা হল। ভদ্রলোক রাস্তাটা দ্রুতপায়ে পেরিয়ে এবার যেখানে ঢুকলেন সেটা একটা রেষ্টুরেন্ট। বহুলোক খাচ্ছে সেখানে। টেবিলে টেবিলে জোর আড্ডা। গৌতম ভেতরে ঢুকে দেখল পরিবেশ অনেকটা শিলিগুড়ি কলকাতার রেষ্টুরেন্টগুলোর মতোই। তফাত শুধু লোকগুলোর ভাষা আকৃতি ও কিছু কিছু পোশাকে। মিশরীয়রা বেশির ভাগই দীর্ঘকায় ও স্বাস্থ্যবান। এদের জাতীয় পোশাক হচ্ছে গালাবীয়া। অর্থাৎ বড় গাউনের মত আলখাল্লা। আর মাথায় টুপি। এই পোশাকটা অবশ্য রাস্তায় বিশেষ লক্ষ্য করেনি গৌতম। তবে এখানে কয়েকজনের গায়ে সেটা নজরে পড়ছে।

এদের ভিড় ঠেলে ভদ্রলোক ওকে নিয়ে কোণের একটা খালি

টেবিলের কাছে এলেন।—তুমি বস। আমি দেখে আসি তোমার খাবার কি পাওয়া যায়।

গৌতম ঘুরে চট করে বলল, শুনুন। আমি কিন্তু সামান্যই খাব। এখানকার দাম টাম খুব বেশী হবে না তো ?

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না। ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন। কায়রো তেমন খরচের শহর নয়। তবে এখানকার সব রান্না হয়তো তোমার ভালো লাগবে না। তাই দেখছি কি বলা যায়।

বলেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন। গৌতম চারদিকে চোখ বুলিয়ে চেয়ারে বসল এবার। একটু পরেই তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে গৌতমকে বললেন, তোমার খাবার আসছে। আমি সব বলে এসেছি।—তাহলে চলি, কেমন ?

গৌতম খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। —আপনি কিছু খাবেন না ?

—না ভাই। আমার একটু তাড়া আছে। তোমাকে একটা ভালো খাবার জায়গা দেখিয়ে দিলাম, আর কি। এখন চলি। গুড নাইট।

ভদ্রলোক আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

গৌতমের এবার সত্যি বেশ খারাপ লাগল। ভদ্রলোক যে ওকে সাহায্য করার জন্যই এতদূর ছুটে এসেছিলেন সেটা এখন স্পষ্ট হওয়ায় নিজের ওপরই রাগ হল ওর। অথচ একটু আগে তাঁকে নিয়ে কত আজে বাজে কথাই না ভেবেছে।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পরেই একজন বেয়ারা এসে ওর খাবার পরিবেশন করল। একটা প্লেটে খানচারেক রুটি আরেকটাতে মাংস। মাংসটা শুকনো। অনেকটা কিমার তরকারীর মত। একটা বিচিত্র মশলার গন্ধের জন্য সেটা প্রথম প্রথম খেতে একটু অসুবিধে হল গৌতমের। কিন্তু দুটো রুটি খাবার পরেই স্বাদটা ভালো লেগে গেল। এত ভালো যে চারটে শেষ করেই আর একটা রুটির অর্ডার দিল সে।

খাওয়া শেষে হাত মুখ ধুয়ে বেয়ারাকে ডাকল গৌতম। ইশারায় জিজ্ঞেস করল, কত হয়েছে ?

আরবী ভাষায় কি যে বলল ছেলেটা, কিছুই বোঝা গেল না। তখন পকেট থেকে কতগুলো মিশরীয় মুদ্রা বের করে ও টেবিলের ওপর রাখল। বেয়ারাটাকে হাতের ইঙ্গিতে বলল, খাবারের দামটা এখান থেকে তুলে নাও। সে এগিয়ে যা তুলল তাতে ভীষণ অবাক হয়ে গেল গৌতম। ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য দাঁড়ায় মাত্র এক টাকা। আশ্চর্য, এত সস্তা! পাঁচটা রুটি ও মাংসের দাম মাত্র এক টাকা। কায়রো সত্যিই তো খুব সস্তার জায়গা।

মনে মনে সেই অপরিচিত ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল গৌতম। ধীরে সুস্থে সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে সরু গলির দিকে যেতে যেতে ভাবল, এ রকম সস্তার হোটেল থাকতে বাইরের ফেরিওয়ালাদের খোঁজ করার কোন মানেই হয় না। কালও এখানেই খেতে আসবে ও।

গৌতম কৃতজ্ঞচিত্তে যার কথা ভাবতে ভাবতে ইয়ুথ হোস্টেলের দিকে ফিরল সেই অপরিচিত লোকটির নাম জামিল। জামিল কিন্তু মোটেই তেমন লোক নয় যেমনটি ভাবছিল গৌতম।

সে গৌতমের খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেষ্টুরেন্টের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল কায়রোর দক্ষিণ দিকে। ওর ঠোঁটে তখন চাপা খুশির হাসি। ট্যাক্সিটা প্রায় কুড়ি মিনিট বাঁদিক ডানদিক এ-রাস্তা ও-রাস্তা হয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

জামিল গাড়ি থেকে নেমে মিটারের ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির সিঁড়িতে উঠে দরজায় টোকা মারল। একজন ময়লা জামা কাপড় পরা ছোকরা বেরিয়ে এল বাইরে। জামিলকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। জামিল দোতলায় উঠে গেল।

সেখানে একটা ঘরে মধ্যবয়সী এক ইংরেজ কোচে বসে পাইপ খাচ্ছিল। স্বাস্থ্য ভাল তার। চোখদুটো কটা। গাল আর থুতনিতে

চাপ চাপ দাড়ি। জামিলকে দেখেই সে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ব্যগ্রস্বরে বলল, কি খবর ?

—ভালই। জামিল ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে নিশ্চিন্তির একটা হাসি হাসল।—একজন ভারতীয় হিচ-হাইকার ট্যুরিস্টের সন্ধান পাওয়া গেছে।

—সম্পূর্ণ একা ?

—হ্যাঁ সম্পূর্ণ একা। তাছাড়া ওর বয়স মাত্র ষোল কি সতেরো।

—ষোল, সতেরো! ইংরেজটি অবিশ্বাসের চোখে তাকাল, বল কি হে! ঐটুকু এক ভারতীয় ছোকরা একা এসেছে ?

—হ্যাঁ অবাক হবার কিছু নেই। জামিল আর একটা কোচে বসে বলল, ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে দেখলাম ও পাকা ট্যুরিস্ট। এর মধ্যে একা একা বহু জায়গা ঘুরেছে। অবশ্য সেগুলো ভারতেই।

—খুব ভালো কথা। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বল। আমাদের কাজ হবে একে দিয়ে ?

—আলবাত হবে। বরং ভালোভাবেই হবে। একটা নিঃসঙ্গ ভারতীয় ছেলে একা ইয়োরোপে বেড়াতে যাচ্ছে, এর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কোথায়। নির্ভাবনায় কাজ সারতে হলে একেই আমাদের প্রয়োজন।

—ঠিক আছে। কিন্তু কবে যাচ্ছে ও এখান থেকে ?

—কাল রাতেই। জামিল গলার টাইটা আলগা করে বলল, এর মধ্যে ছেলেটার সঙ্গে আর একটু জমিয়ে নিতে হবে। ব্যাস্ তারপরেই আমি ওকে পটিয়ে ফেলব।

—বেশ বেশ। খবর তাহলে নিশ্চয়ই ভাল। ইংরেজটির চোখে মুখেও হাসির আভাস ছলকে উঠল। পর মুহূর্তেই কপাল কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, কিন্তু জামিল, নজর বাঁচিয়ে সব করেছ তো। রাফায়ো কিন্তু সাংঘাতিক লোক। ওর চর যে কোথায় আছে কিছু বলা যায় না।

—আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি এ ব্যাপারে সব সময় খুব সতর্ক

ছিলাম। জামিল আশ্বাস দিল, রাফায়োর চর তো দূরের কথা রাস্তার লোকেরাও আমাকে ঐ ছেলেটির সঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করেনি।

এদিকে এই দুজনের মধ্যে যখন এত গোপন কথা-বার্তা চলছে তখন কায়রোর আরেক প্রান্তে আরেকটা গুপ্ত ঘরে বসে সেই রাফায়ো কথা বলছে তার এক চরের সঙ্গে। রাফায়ো ইটালিয়ান, কিন্তু তার সঙ্গীটি হচ্ছে লেবাননের লোক। ওর নাম নিশাত। রাফায়োর বয়স চল্লিশ। লম্বা দোহারা চেহারা। নিশাত তরুণ, দীর্ঘকায় ইস্পাতের মত কঠিন তার স্বাস্থ্য।

—আজ পাঁচদিন ধরে জামিলকে আমি অনুসরণ করে চলেছি। রোজই ভাবছি আজই বোধহয় সে দেশ ছাড়বে। কিন্তু আজ যে কাণ্ডটা ও করল তা মোটেই ভালো ঠেকছে না। কথাগুলো বলছিল নিশাত। ও তখনও হাঁপাচ্ছে।

—কি করেছে? রাফায়ো ঝুঁকে বসল।

—পরশুর মত আজও সে এয়ারপোর্টে এয়ার ইণ্ডিয়ার একটা প্লেন এ্যাটেণ্ড করতে গিয়েছিল। এই প্লেনে অল্প বয়সী একটা ভারতীয় ছেলে এসেছে। জামিল আজ ওকে শুধু অনুসরণ করে গেছে।

—কেন, তার কারণ কি?

—তা কিছুই মাথায় ঢুকছে না। নিশাত ঠোঁট ওলটালো।

—জামিল ওর পেছু নিয়েছিল বলে আমার যা আজ ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে কি বলব। নেহাত চেহারাটা পালটেছিলাম, তবু খুব সাবধানে ওর সঙ্গে থাকতে হচ্ছিল।

—ছেলেটি কি একা?

—হ্যাঁ একা।

—কোথায় উঠেছে?

—ইয়ুথ হোস্টেলে।

—জামিলের সঙ্গে ওর কি কোনো কথাবার্তা হয়েছে?

—হয়েছে। নিশাত ঘাড় নাড়ল, এয়ারপোর্ট থেকে ওর পেছু পেছু

ইয়ুথ হোস্টেল পর্যন্ত সে এসেছে। তারপর বাইরে এক জায়গায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ছেলেটা যখন হোস্টেল থেকে বেরোল তখন অপেরাতে ওদের আলাপ হয় সেখান থেকে দুজন যায় রুফাই সরাইখানায়। ওখানে অবশ্য বেশিক্ষণ ছিল না জামিল। ছেলেটাকে সরাইখানায় ছেড়েই সে একটু পর বেরিয়ে আসে।

—কোথায় যায় তারপর ?

—বোধহয় আস্তানাতেই। ওকে একটা ট্যাক্সিতে চড়তে দেখে আমি ছেলেটার সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে ইয়ুথ হোস্টেলে গেলাম।

—কি জানলে ?

—ছেলেটা ইণ্ডিয়া থেকে এসেছে কালই চলে যাবে। তবে কোথায় যাবে সেটা ওরা বলতে পারল না।

—খুব চিন্তার কথা। রাফায়ো গভীর দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকাল। তারপর মাথায় হাতের টোকা মেরে বলল, ইয়োরোপে যাবে কি ? তোমার কি মনে হয় ?

—যেতেও পারে। কিন্তু তাতে ওদের কি লাভ ?

রাফায়ো কিছু বলল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মিনিট দুয়েক গম্ভীর হয়ে কি ভেবে নিশাতের কাছে ফিরে এসে বলল, একটা ভারতীয় ছেলে একা ইউরোপ যদি যায় তার সঙ্গে জামিলের যোগাযোগের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। যাই হোক কাল তুমি সকাল থেকেই ইয়ুথ হোস্টেলের ওপর নজর রেখ। জামিল আবার ওর কাছে যাবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তারপর ও কি করে সেটাই এখন লক্ষ্য করার বিষয়। আর একটা কথা, তোমার পাসপোর্টে বয়স কত লেখা আছে ?

—কেন, সাতাশ কি আঠাশ। বলেই নিশাত ওর তাপ্পিমারা বড় হিপ পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে দেখল। মনে মনে হিসেব করে বলল, এইতো সাতাশ বছর চার মাস।

—তোফা, ওটাই চাই। রাফায়ো মাথা ঝাঁকাল। কাল তোমাকে

আর একটা কাজ করতে হবে। ঐ ইয়ুথ হোস্টেলে গিয়ে নিজের নামে একটা কার্ড করে ফেল, বুঝেছ ?

—কার্ড। নিশাত অবাক হয়ে তাকাল।

—হ্যাঁ। ইয়ুথ হোস্টেল মেম্বারশীপ কার্ড।

নিশাত কিছু বুঝল না। কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দিল, ঠিক আছে করে নেব।

পরদিন খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠল গৌতম। আজ ওর বিদেশ ঘোরার আসল পর্ব শুরু। আজ সারাদিনে ওকে কায়রোর সব কিছু দেখে নিতে হবে। তাই চান-টান সেরে চটপট ও হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে ও নীল নদের ধারে এল। নীল ইয়ুথ হোস্টেলের কাছেই। সেটা কায়রোর ট্যুরিস্ট ম্যাপ দেখেই জানা গেছে। নদীর ধারে একটা পার্কে কিছুক্ষণ বসে তারপর সে ম্যাপের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে করতে মিউজিয়ামের দিকে পা বাড়াল।

ম্যাপ দেখে কোন শহরে চলাফেরা করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। এভাবে ভারতেও বড় বড় শহরে ঘুরেছে গৌতম। ম্যাপের রাস্তার নামের সঙ্গে চলার রাস্তার নামটা শুধু মিলিয়ে নিলেই হল তবে এখানে নামগুলো আরবীতে লেখা বলেই একটু যা অসুবিধে হচ্ছিল। তবু গৌতম ম্যাপ দেখে রাস্তার নামগুলো কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই ওর গন্তব্য স্থানের হদিশ পেয়ে গেল। এর জন্য ভাষা না জানাটা ওর পক্ষে কোন বাধাই হল না। নীল নদের ধার দিয়ে কিছু দূর গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিতেই সেই তাহরির স্কোয়ার। তার এক কোণের বিরাট দোতলা প্রাসাদটাই হল পৃথিবী বিখ্যাত ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম।

মিউজিয়ামটা তখনও খোলেনি। গৌতম খোঁজ নিয়ে জানল ওটা খুলবে মিনিট পনেরো পর। ততক্ষণে সকালের জলখাবারটা সেরে

নেবার জন্য সে এদিক ওদিক তাকাল। কিছু দূরে একটা লোক তরমুজ বিক্রি করছে। গৌতম এগিয়ে গেল সেদিকে।

ফলাহার সেরে মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখতে সময় লাগল পুরো তিন ঘণ্টা। কায়রোর এই মিউজিয়ামে রয়েছে প্রাচীন মিশরের অমূল্য সব শিল্প সম্পদ। প্রাগৈতিহাসিক মিশরীয় সভ্যতার সেই দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যগুলো দেখতে দেখতে গৌতম মুগ্ধ হয়ে গেল। বিশেষ করে টুটেনখামেনের সমাধির ভেতর পাওয়া সংগ্রহগুলো ওকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলল। টুটেনখামেনের মমিটাও দেখতে কি অদ্ভুত।

খুটিয়ে খুটিয়ে সব নিরীক্ষণ করে গৌতম মিউজিয়াম থেকে বেরুল যখন তখন দুপুর বারোটা। এবার ওকে যেতে হবে পিরামিড ও স্ফিংকস্ দেখতে। ওগুলো কায়রো শহরের উপকণ্ঠ গীজা অঞ্চলে। ওখানে যাওয়ার আগে দুপুরের খাওয়াটা এদিকেই সেরে নেওয়া ভালো। কথাটা ভেবেই গত রাতের সেই রেষ্টুরেণ্টের দিকে পা বাড়াল গৌতম।

রেষ্টুরেণ্টটা কাছাকাছিই ছিল। একটু খুঁজতে হলেও সেখানে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। ভেতরে ঢুকে সেই কোণের টেবিল। গতকালের বেয়ারাটা ওকে দেখেই চিনতে পারল। গৌতম ইশারায় ওকে বলল কালকের একই খাবার নিয়ে আসতে।

পাঁচটা রুটি ও মাংস। খাওয়া শেষ করে যথাপূর্বক গতকালের পয়সাটা রাখল ও টেবিলের ওপর। বেয়ারাটা ঘাড় ঘোরাল। আকার ইঙ্গিতে বলল না, ওতে হবে না আরও চাই।

আরো চাই! গৌতম অবাক। ইংরেজী ও ইশারায় বলল, কেন কালতো তুমি এই দামই নিয়েছিলে।

লোকটা তখন আরবী ভাষায় গর গর করে কি সব বলল। মোদ্দা বোঝা গেল আরো পয়সা লাগবে।

গৌতম চটে উঠল এবার।—না আর একটিও পয়সা নয়। কাল এই দামে একই জিনিস খেয়েছে সে। আজ বেশি কেন?

ওদের বাকবিতণ্ডা শুনে রেষ্টুরেণ্টের মালিক এগিয়ে এল। তাতেও

কোন সুরাহা হল না। কারণ সেও আরবী ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আকার ইঙ্গিতে তারও বক্তব্য একই। পয়সা আরো চাই।

আরো চাই, তাহলে কত ? গৌতম এবার রেগে গিয়ে পকেট থেকে সব টাকা পয়সা বের করে টেবিলের ওপর রাখল। রেষ্টুরেন্টের মালিক তখন ওর ভেতর থেকে যা তুলল তা প্রায় ভারতীয় মুদ্রায় আট টাকার সমান।

তার মানে ? কাল যার দাম এক টাকা ছিল আজ তা বেড়ে হল আট টাকা। কি পেয়েছ তোমরা ? বিদেশী দেখে ঠকিয়ে নিতে চাও ? কখনও তা হবে না।

গৌতম তার হাত থেকে পয়সাগুলো নিয়ে পকেটে পুরে নিল। ইংরেজীতে বলল, আমি দেব না। তোমরা পুলিস ডাকতে পার, তাকেই আমি সব বলব।

মালিকটা তখন দুর্বোধ্য ভাষায় বেয়ারাকে কি সব বলে রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পর এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল আবার।

ভদ্রলোক গৌতমের কাছে এসে সুন্দর ইংরেজীতে বললেন, আপনার কি কিছু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হচ্ছে। গৌতম একটু রাগত স্বরে বলল, কাল আমি এখানে একই জিনিস খেয়ে যা দাম দিয়েছি, আজ এরা তার থেকে আটগুণ বেশি দাম চাইছে।

ভদ্রলোক রেষ্টুরেন্টের মালিককে আরবী ভাষায় ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলেন। সে তখন বলে গেল তার কথা। ওকে আর কয়েকটা প্রশ্ন করার পর তিনি গৌতমের দিকে ঘুরে ইংরেজীতে বললেন, মিষ্টার তোমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কাল তুমি যখন এখানে এসেছিলে কেউ কি তোমার সঙ্গে ছিল ?

—হ্যাঁ এক ভদ্রলোক ছিলেন।

—তুমি বোধহয় জান না তোমার কালকের খাবারের দামটা তিনিই দিয়ে গেছেন।

—তিনি দিয়েছেন। গৌতম হতবাক।

—হ্যাঁ এরা বলছে, কাল তুমি নাকি ঐ ভদ্রলোক চলে যাবার পর একটা রুটি শুধু নিয়েছিলে। এই রুটির দামটাই শুধু এরা তোমার কাছ থেকে নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি ঐ রুটির দামের সঙ্গে আজকের খাবারের দামটা গুলিয়ে ফেলছ। তাই কি?

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তাহলে এই ব্যাপার? গৌতম লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেল। কিন্তু ও কি করে জানবে যে ভদ্রলোক গতকাল ওর চারটে রুটি আর মাংসের দাম ওকে না জানিয়ে দিয়ে গেছেন। সস্তায় খাওয়ার আসল রহস্য তাহলে এই?

গৌতমের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। রেষ্টুরেন্ট মালিকের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতেই বলল, আমি খুব দুঃখিত। সত্যি বুঝতে ভুল হয়েছে আমার। কিছু মনে করবেন না। এই নিন আপনার টাকা। পকেট থেকে টাকা পয়সাগুলো বার করে আবার সে রাখল টেবিলের ওপর।

মালিক এবার হাসতে হাসতে ওর দামটা তুলে গৌতমের পিঠে হাত রেখে আরবী ভাষায় কি যেন বলল।

ইংরেজী জানা ভদ্রলোকটিও মুচকি হাসলেন। গৌতমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বিদেশে ভাষার অসুবিধের জন্য এরকম ভুল হয়ই। এতে মনে করার কি আছে। তা তুমি আসছ কোথা থেকে?

—ইণ্ডিয়া। গৌতম টেবিলে পড়ে থাকা বাকি পয়সাগুলো তুলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আরো কয়েকটা কথা বলে আস্তে আস্তে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে এসে ও অবাক হয়ে ভাবতে লাগল গত রাতের সেই ভদ্রলোকের কথা যিনি নিঃশব্দে গৌতমকে না জানিয়ে ওর খাবারের পয়সা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যে কাজটা একজন বিগত ভারতবাসী হিসেবে গৌতমকে ভালোবেসেই করেছেন এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকের এই গোপন আন্তরিকতা ওকে মুগ্ধ করে

দিল। বিভোর হয়ে তার কথা ভাবতে ভাবতেই সে তাহরির স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর পিরামিড। ট্রলি বাসে করে সেখানে পৌঁছতে এক ঘণ্টাও লাগল না। বাস থেকে নেমে একটা উঁচু জায়গা পেরোতেই সাক্ষাৎ মরুভূমির ওপর পৃথিবীর পুরাকালের সপ্ত-আশ্চর্যের এই একটির সামনে আসতেই গৌতমের বুক উত্তেজনায় শির শির করে উঠল। পর পর মোট তিনটে পিরামিড। মিশরের ফারাও রাজারা তাদের মমি সুরক্ষিত রাখার জন্য এই দানবাকার কীর্তিগুলো রচনা করে গিয়েছিলেন। পাশে বিশাল নারীসিংহী মূর্তি স্ফিংকস্। কিছুক্ষণ সেদিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকার পর গৌতম পা বাড়াল।

রাত নটা নাগাদ গৌতমের কায়রো পরিদর্শন শেষ হল। গীজা থেকে ফিরে শহরের এদিক ওদিক কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াল সে। ম্যাপ দেখে অপরিচিত শহরে এভাবে উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে ওর খুব ভাল লাগে। ঘুরতে ঘুরতেই কায়রোর এক বাজারে ঢুকে রাতের খাওয়াটাও সেরে নিল। কিছু ফল ও পাউরুটি।

তারপর ইয়ুথ হোস্টেলে যখন ফিরল, এক তলার অফিসের সেই মোটা সোটা ভদ্রলোকটি ওকে ডাকলেন।

গৌতম এগিয়ে গেল।

—তোমার নামই তো মজুমদার। একটি লোক তোমায় সকাল থেকে খুঁজছে। দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে ?

—না তো। গৌতম একটু থমকে জিজ্ঞেস করল, কে তিনি ?

—তা জানি না। ভদ্রলোক জবাব দিলেন, তবে এখানকারই লোক। মনে হল তোমায় না পেয়ে খুব উৎকণ্ঠিত। তিনবার এসেছিল আজ।

এখানকার লোক ! তার মানে কালকের সেই হিন্দী জানা মিশরীয় ভদ্রলোক কি ? গৌতম সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, বয়স কত হবে তার চল্লিশ, বেয়াল্লিশ ? সুট-টাই পরেছিলেন ?

—না না। সাধারণ পোশাক। বয়স আরো বেশি ষাট কি পঁয়ষট্টি।

গৌতম থতমত খেয়ে গেল। এই লোকটি যে কে আর কেনই বা খুঁজছে ওকে কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

তখন হোস্টেলের কর্মচারীটি বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও। ও হয়তো আবার আসবে তখন আমি তোমায় ডেকে পাঠাব।

চিন্তিত গৌতম ধীর পায়ে ওপরে উঠে গেল। কায়রোর মত এই অপরিচিত জায়গায় ওর নাম করে কেউ তিনবার ওকে খুঁজে গেছে এটা একটা অভাবনীয় ঘটনা। লোকটা যে কে না জানা অবধি নিশ্চিন্তি নেই। কিন্তু আর খানিকক্ষণ পরেই ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে। এবার ওর বিদায়ের পালা। কায়রো ছেড়ে প্যারিস, প্যারিসের প্লেন সেই শেষ রাতে। কিন্তু এই অজানা দেশে গভীর রাত না করে আগে থাকতেই সে এয়ার পোর্টে পৌঁছে যেতে চায়। মাঝখান থেকে ভারী চিন্তায় ফেলে দিলো এই আগন্তুক।

বেরোনোর জন্য তৈরী হয়ে রাত এগারোটা অবধি অপেক্ষা করল গৌতম। কিন্তু এর মধ্যে কেউ এল না। এরপর আর দেরী করা ঠিক নয় ভেবে ও হোস্টেলের কর্মচারীটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে মেন বাস-ষ্ট্যাণ্ড। বাস-ষ্ট্যাণ্ডটা তখন প্রায় ফাঁকা। লোকজন বিশেষ নেই। ছায়া ছায়া অন্ধকারে দু-একটা মাত্র বাস দাঁড়িয়ে। গৌতম বাস গুমটির কাছে এসে দেখল ভেতরে ট্রান্সপোর্টের কর্মচারীও কেউ নেই। একটু ফাঁপরে পড়ল সে। এদের সাহায্য ছাড়া এই রাত্তির বেলা এয়ার পোর্টের বাস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

এমন সময় পেছন থেকে একটি পরিচিত গলা শুনে ও চমকে উঠল।

—এই যে মিষ্টার চিনতে পারছ ?

আধো অন্ধকারে মুখটা ঠিক দেখা না গেলেও গলার আওয়াজেই বুঝতে পারল গৌতম এই সেই গত কালের হৃদয়বান ভদ্রলোক। ওকে সেই রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গী।

তিনি ইংরেজীর পর এবার হিন্দীতেই বললেন, তোমার প্লেন রাত তিনটের সময় তাই না ?

—হ্যাঁ। গৌতম পিঠের রুকস্যাকটা মাটিতে নামিয়ে অমায়িক ভঙ্গিতে হাসল।

—আমি আজ তোমার খোঁজে তিন বার ইয়ুথ হোস্টেলে লোক পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু তুমি যে খুব ভোরেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়বে ভাবতে পারিনি। আবার এখন নিজে গিয়ে শুনলাম তুমি এয়ারপোর্টে রওনা হয়ে গেছ। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।

যাক, সেই আগন্তুকের রহস্যের সমাধান এবার হল। কিন্তু ভদ্রলোক ওকে এত হন্যে হয়ে খুঁজছে কেন। কথাটা বলেই ফেলল গৌতম—ব্যপার কি, আমায় আপনার খোঁজার কারণ ?

—কারণ ? আবছা অন্ধকারে ভদ্রলোকের সাদা দাঁতগুলো চিক চিক করে উঠল। একটু হেসে গৌতমের পিঠে গাঢ় হাত রেখে বললেন, সকালে লোক পাঠিয়ে ছিলাম তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভেবেছিলাম আজ আমি তোমাকে কায়রো শহরটা ঘুরিয়ে দেখাব। ইণ্ডিয়াতে বহুদিন ছিলাম কিনা তাই কাল তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু এখন বলে আর কি হবে। তোমার কোন উপকারে এলাম না বলে সত্যি আমার খুব খারাপ লাগছে।

গৌতম এই আন্তরিক কথাগুলো শুনে অভিভূত হয়ে গেল। আর্দ্র কণ্ঠে বলল, কি যে বলছেন, আমার উপকার তো আপনি কালই করে গেছেন। বরং আমি আপনাকে এজন্য কোন ধন্যবাদ দিই নি। ঐ অস্বাস্থ্যকর জায়গায় খাবার খেলে নির্ঘাত আমার অসুখ করত। তাছাড়া গতকাল আমার ডিনারের দামটাও যে আপনি দিয়ে গেছেন কই, তা তো আমাকে বলেন নি।

—আর লজ্জা দিও না। ও আবার এমন কি কাজ যে বলতে হবে। বলে ভদ্রলোক নিচু হয়ে গৌতমের রুকস্যাকটা হাতে উঠিয়ে নিলেন।—চল আর দেরী করা ঠিক নয়।

—সেকি, আপনি ?

—এস না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। তোমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিচ্ছি।

এরপর আর কি করা যায়। গৌতম ভদ্রলোককে অনুসরণ করল। বড় রাস্তার ধারে এসে তিনি চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তাটা পেরিয়ে ওপারের অন্ধকারে ঢুকে পড়লেন। সেখানে একটা ছোট মোটর গাড়ি দাঁড় করান ছিল।

স্টিয়ারিঙে ভদ্রলোক, পাশে গৌতম। পেছনের সীটে ওর রুকস্যাক। শহরের এলাকাটা না পেরুনো অবধি ভদ্রলোক আর কোন কথা বললেন না। এত রাত বলে রাস্তা তখন ফাঁকা। গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা আশীতে। ঠিক দশ মিনিট পর যখন শহরতলির একটা নির্জন রাস্তা এল তখন তিনি মুখ খুললেন।

গাড়ির গতি একেবারে কুড়িতে নামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, কায়রোতে তোমার কোন উপকারেই আমি এলাম না। সেজন্য কথাটা বলতে খুব লজ্জা হচ্ছে, ইয়োরোপ যাচ্ছ আমার একটা কাজ করে দেবে ভাই?

গৌতম তাকাল। বিনয়ের সুরে বলল, আমার দ্বারা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করবো। বলুন কি কাজ?

—কাজটা তোমার পক্ষে হয়ত সামান্যই, কিন্তু আমার কাছে খুব জরুরী। তার আগে বল এখান থেকে প্যারিস গিয়ে তারপর তুমি যাবে কোথায়?

—তার কোন ঠিক নেই। গৌতম জবাব দিল, সেটা প্যারিস গিয়েই বোঝা যাবে।

—কেন, তোমার বেড়ানোর কোন প্রোগ্রাম নেই?

—মোটামুটি একটা আছে। তবে হিচ হাইকিং করে ঘুরব তাই ঠিক বলতে পারছিনা প্যারিস থেকে কোথায় আগে যাব। মানে বুঝতে পারছেন তো আমার ঘোরাটা গাড়ির লিফটের ওপরই নির্ভর করছে।

—তা অবশ্য ঠিক। তবে আমি বলি কি তুমি প্যারিসের পর প্রথমে ইটালি যাও। ইটালিতে অনেক দেখবার জায়গা—রোম,

ভেনিস, নেপলস, ফ্লোরেন্স। আমার মতে সেটা আগে ভাগে সেরে রাখাই ভাল।

—সঙ্গতি পেলে তাই যাব। গৌতম মৃদু হাসল।

—সঙ্গতির ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। ও নিয়ে তুমি ভেবো না।

—তার মানে? গৌতম অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাল।

ভদ্রলোক গাড়িটা এবার একবার পেছন দিকে তাকিয়ে থামিয়ে দিলেন। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে গৌতমের দিকে ঘুরে বললেন, আমার একটা দরকারি চিঠি রোমের এক ভদ্রলোকের কাছে তোমায় পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্য প্যারিস থেকে রোম যাওয়ার ভাড়া আমি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।

—ছিঃ ছিঃ, ভাড়া দেবেন কেন? গৌতম প্রতিবাদ করে উঠল, রোম আমি এমনিতেই যাব। তখন নিশ্চয়ই আপনার চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দেব। সঙ্গতি বলতে আমি গাড়ির লিফটের কথা বলছিলাম।

—জানি। ভদ্রলোক মাথা দোলালেন। কিন্তু ও ব্যাপারটা অনিশ্চিত। কখন কি রকম গাড়ি পাবে তার তো কোন ঠিক নেই। অথচ আমার এই চিঠিটা রোমে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া যায় তত ভাল। চিঠিটা এতই জরুরী যে ডাকে পাঠাতে আমার ভরসা হচ্ছে না। হারিয়ে গেলে খুব মুশকিলে পড়তে হবে। সেজন্যই ভাড়াটা আমি তোমায় দিতে চাই। যাতে প্যারিস দেখে তুমি খুব তাড়াতাড়ি রোমে পৌঁছে যাও।

ভদ্রলোক ওপরের দিকে হাত তুলে গাড়ির ভেতরের আলোটা জ্বালালেন। তারপর কোটের পকেট থেকে একটা সীল করা খাম বার করে গৌতমের হাতে দিয়ে বললেন, ওপরে নাম ঠিকানা লেখা আছে। তবু আমি বলে দিচ্ছি রোমে নেমে কি ভাবে যাবে সেখানে।

গৌতম সযত্নে খামটা ধরল। ওপরের ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে বলল, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন আমি ঠিক পৌঁছে দেব। এটা আর এমন কি কাজ।

—এই নাও তোমার রোম যাওয়ার ভাড়া।

গৌতম ভদ্রলোকের বাড়ান হাতের দিকে তাকিয়ে আকাশ থেকে পড়ল। সে-হাতে এক তাড়া দশ ডলারের নোট। এবার একটু ক্ষুণ্ণ হল সে। গম্ভীর সুরে বলল, দেখুন আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, প্যারিস থেকে প্রথমে রোম যাওয়ারই চেষ্টা করব। এজন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে না। ওটা রেখে দিন।

—আশ্চর্য। তুমি ওটা ওভাবে দেখছ কেন। তোমার সঙ্গে হঠাৎ যদি এখানে আমার পরিচয় না হত তাহলে আমাকে আরো অনেক বেশি খরচ করে নিজেই ওটা রোমে পৌঁছে দিতে হত। সে জায়গায় আমি তোমায় দিচ্ছি মাত্র প্যারিস থেকে রোমের ভাড়া। কারণ আমি চাই এই চিঠিটার জন্য অন্তত ঐ টুকু পথ তুমি হিচ হাইকিং না কর। এটা আমার একান্ত অনুরোধ। ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা।

অগত্যা কি আর করা। রাজী হতেই হলো। নিল সে, কিন্তু সব নয়। পুরো টাকাটা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ডলার নিয়ে বাকীটা ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিল। ভদ্রলোক দিচ্ছিলেন তাকে মোট দুশো ডলার।

ভদ্রলোক এবার নিজের পরিচয় দিয়ে রোমের ভদ্রলোককে কি বলতে হবে নির্দেশ দিতে দিতে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

পারী ২

তারপর প্যারিস।

কায়রো থেকে প্লেনটা ছেড়েছিল রাত তিনটের একটু পর। জেনেভা হয়ে প্যারিসে এসে পৌঁছল সকাল দশটায়।

প্লেনে প্যারিস অর্থে ওরলি এয়ার পোর্ট। সকালের আবহাওয়াটা তখন বেশ ঠাণ্ডা। অনেকটা মে মাসের দারজিলিং-এর মত। গৌতম প্লেনের ভেতরেই গায়ে সোয়েটার ও কোট চাপিয়ে নিয়েছিল। এখানে নেমে চারদিকের তাণ্ডবলীলা দেখে ও তাজ্জব বনে গেল। চারপাশে কত যে প্লেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রতি মিনিটেই বিমান

ঘাঁটির কোথাও না কোথাও একটা প্লেন নামছে, আর একটা উড়তে চলেছে। লাউঞ্জে গাদা গাদা যাত্রী। কিন্তু কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এখানেই প্রথম গৌতম প্লেন থেকে এরো ব্রিজে হেঁটে একেবারে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জের ওপর পা রাখল। তারপর লাইন দিয়ে দিয়ে সেই পাসপোর্ট ও হেল্‌থ চেকিং। কিন্তু কায়রোর মত অত সময় লাগল না। আধ ঘন্টার মধ্যেই ব্যাপার দুটো শেষ। কাষ্টমস্ চেকিং-এর জন্য বাইরে এসে নিজের লাগেজের কথা জিজ্ঞেস করতেই এয়ার পোর্টের একজন কর্মচারী ওকে নীচে যেতে নির্দেশ দিল। ওর নির্দেশ অনুযায়ী এস্‌কেলেটারে করে অর্থাৎ চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় নামল গৌতম। নেমেই দেখল ডান দিকে একটা কনভেয়ার বেল্টের ওপর অনেক মাল পত্রের সঙ্গে ওর রুকস্যাকটা ঘুরছে। কিন্তু সেখানে কাস্‌টমস চেকিং-এর কোন চিহ্ন নেই। গৌতম একটু অবাক হল। কনভেয়ার বেল্টের সামনেই ছিল একটা দরজা। তারপর বাইরের লাউঞ্জ। দরজাতেও উর্দিপরা কাউকে না দেখে ও বুঝতে পারল এখানে এসবের অত কড়াকড়ি নেই। লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের আনাগোনা যেখানে সেখানে বোধহয় সন্দেহের সম্মুখীন না হলে এসব ব্যাপারে কেউ বিরক্ত করে না।

অতএব রুকস্যাকটা তুলে অন্য যাত্রীদের মত সেও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা পেরিয়ে বাইরে বিশাল লাউঞ্জ। রঙীন আসবাব ও ঝলমলে কাঁচের বাহারে চারপাশ ঝকঝক করছে। তার মধ্যে হাজার হাজার সুবেশী যাত্রীর আনাগোনা। গৌতম একটু দাঁড়িয়ে অবস্থাটা বুঝে নিতে চাইল। মাথার ওপর প্রতিমূহূর্তে মাইকের ফরাসী ঘোষণাগুলো অবশ্য ওর মগজে ঢুকল না। তবে এদিক ওদিক লেখা সাইনবোর্ডগুলো ফরাসী ভাষাতে হলেও ইংরেজী অক্ষরে বলে পড়তে পারল। সেই সাইনবোর্ড দেখেই মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টারটা খুঁজে বার করল সে।

কায়রোর মত এখানেও ওকে ট্রাভেলার্স চেক বুকটা বের করতে হল না। কারণ ওর কাছে ছিল মহম্মদ জামিলের দেওয়া পঞ্চাশ ডলার

ও কায়রোর ফেরত পাঁচ ডলার। কায়ারোতে একদিনের থাকা-খাওয়া ও ঘোরা বাবদ গৌতমের খরচ হয়েছিল মাত্র তিন ডলার। বাকি ফেরত মিশরীয় মুদ্রাগুলো সে কায়রো এয়ার পোর্টে প্যারিসের প্লেন ধরার আগে ডলারে পালটে নিয়েছিল। এই মোট পঞ্চান্ন ডলার এখানে ফরাসী মুদ্রায় ও ভাঙিয়ে নিল।

এরপর ট্যুরিস্ট অফিস। প্লেন থেকে এতদূর পৌঁছতে পৌঁছতেই গৌতম বুঝে গিয়েছিল এখানে ভাষার সমস্যাটা মিশরের চেয়েও সঙ্গীন। ইংরেজী প্রায় কেউ বোঝে না। তবে ট্যুরিস্ট কাউণ্টারে বসা মেয়েটি এ ব্যাপারে বেশ পারদর্শী। তার কাছ থেকে না চাইতেই পাওয়া গেল প্যারিস শহর ও মেট্রোর অর্থাৎ পাতাল রেলের দুটো ভাল ম্যাপ। ইয়ুথ হোস্টেলের হদিশ মেয়েটি মেট্রোর ম্যাপে একটা স্টেশনের ওপর পেনসিল রেখে দেখিয়ে দিল। ওর কাছ থেকেই জানল গৌতম এখান থেকে শহরে এয়ারলাইন্সের বাসে গেলে লাগবে পাঁচ ফ্রাঙ্ক আর সিটি বাসে দু'ফ্রাঙ্ক। গৌতম লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এয়ার পোর্টের সামনের বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

বাস স্ট্যাণ্ডটা তখন পুরোপুরি ফাঁকা। মেয়েটির নির্দেশিত বাস ছাউনির তলায় সম্পূর্ণ একা প্রায় আধ ঘণ্টার মত দাঁড়িয়ে গৌতম বুঝতে পারল বাসে এখানে খুব কম লোক চড়ে। তাই এর সংখ্যা এখানে নিশ্চয়ই খুব কম। অথচ ওদিকে অন্য রাস্তা দিয়ে অবিরত হাজার হাজার প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি ও কিছু কিছু এয়ারলাইন্সের বাস শহর মুখে ছুটে চলেছে।

আধ ঘণ্টা পর ওর বাসটি যখন এল, তার চেহারা দেখে গৌতম মুগ্ধ। এ ধরনের অভিনব আধুনিক গাড়ি খুব কমই দেখেছে সে। তার বিরাট দেহের অর্ধেকটাই বিশাল কাঁচের জানলা দিয়ে ঘেরা। তবে অত বড় বাসটার একটাই মাত্র দরজা। একেবারে সামনের দিকে। সেই দরজা দিয়ে ওপরে উঠে গৌতম দেখল ড্রাইভারের ষ্টিয়ারিং-এর পাশে ইঞ্জিনের ঢাকনার ওপর একটা পাত্রে কতগুলো টিকিটের তোড়া ও বেশ কিছু পয়সা। বাসে ড্রাইভার ছাড়া আর

দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই। একটু থমকে গেল সে। এমন সময় ওর পেছন থেকে আর এক যাত্রী উঠে পাত্রটায় কিছু পয়সা রেখে একটা টিকিট নিয়ে সিটে বসে পড়ল। গৌতম এবার ব্যাপারটা বুঝল। এখানে সেলফ-সারভিস। অর্থাৎ নিজের টিকিট নিজেই কাটো। ওকে দাঁড়ান দেখে ধোপ দুরস্ত হ্যাট-পাতলুন পরা ড্রাইভার সাহেব ফরাসী ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করল। গৌতম তখন চটপট মেট্রো ম্যাপটা দেখিয়ে দুটো ফ্রাঙ্ক এগিয়ে দিয়ে বলল, প্লিজ গিভ মি এ টিকিট। ড্রাইভারটি হেসে পয়সাটা নিজেই পাত্রের ওপর ফেলে ওকে একটা টিকিট ছিঁড়ে দিল। গৌতম ম্যাপটা দেখিয়ে ইশারায় এবার বলল, ওকে ঠিক জায়গায় যেন নামিয়ে দেওয়া হয়। আবার হাসল সে। ঘাড় দুলিয়ে ইঙ্গিত করল, ঠিক আছে নামিয়ে দেবো।

গৌতম তারপর জানলার কাছে সিট নিয়ে বসতেই ছেড়ে দিল বাসটা।

ছবির মত মনোরম সব দৃশ্য। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। ফুলের বাগান, পার্ক। রং বেরঙের পোশাক পরা লোক। ঝকঝকে তকতকে রাস্তা, গাড়ি। দেখতে দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো কিছু যাত্রী নিয়ে বাসটা পাল তোলা নৌকার মত শহরে এসে ঢুকল।

তার একটু পরেই ড্রাইভারের হাঁক শোনা গেল। বাসটা তখন দাঁড়ান। গৌতম রুকস্যাকটা হাতে নিয়ে চটপট সামনের দিকে এগিয়ে আসতেই ড্রাইভার বাঁ পাশের ফুটপাতের ওপর বড় বড় হরফে লেখা মেট্রো সাইনটা দেখিয়ে ওকে এখানেই নামতে বলল। ইংরেজীতে ছোট্ট থ্যাঙ্ক-ইউ বলে নেমে গেল গৌতম।

মেট্রো লেখাটার নিচে পাতালে নামার সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই টিকিট কাউণ্টার। গৌতম কাউণ্টারের সামনে গিয়ে ওর মেট্রো ম্যাপ থেকে ইয়ুথ হোস্টেলের স্টেশনের নামটা আওড়ে দুটো ফ্রাঙ্ক এগিয়ে দিল। ভদ্রমহিলা এক ফ্রাঙ্ক ফেরত দিলেন। আর এক ফ্রাঙ্কের টিকিট দিয়ে হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন কোন দিকে যেতে হবে।

আলো ঝলমলে সেই লম্বা টানেলের দিকে এগিয়ে গেল গৌতম। ঢালু জমি দিয়ে আরও নিচে নামতে নামতে ওর বুকে একটা শিহরণ খেলে গেল। মাটির নীচে রেল এই প্রথম ও দেখবে। দু পাশের সারি সারি উজ্জ্বল বিজ্ঞাপনের শো-কেসগুলো পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত স্টেশন।

স্টেশন তো নয় যেন পাতালের এক স্বপ্নপুরী। তার সাজ-বাহারের ধরন দেখে তাক লেগে যায়।

কিন্তু এই স্বপ্নপুরীতে ভালভাবে তাকানোর এক মিনিটও সময় পাওয়া গেল না। তার আগেই হুশ করে একটা ট্রেন সামনের লাইনে এসে দাঁড়াল। সবার সাথে গৌতমও চটপট উঠে পড়ল একটা বগিতে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের কাঁচের দরজাগুলো আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ছেড়ে দিল গাড়িটা। ওফ্, সেকি স্পীড! গৌতম সীটে বসে ওর ছোট্ট মেট্রো ম্যাপের ওপর লক্ষ্য রাখল। ম্যাপ অনুযায়ী এই স্টেশনের পর আরো চারটে স্টেশন, তার পরেই ওরটা।

চারটে স্টেশন পেরোতে মিনিট দশেকও লাগল না। যথাস্থানে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে অর্থাৎ পাতাল থেকে মর্ত্যে এসে একজন পথচারীকে ঠিকানাটা দেখাল সে। তিনি হাতের ইশারায় বলে দিলেন।

মেট্রো স্টেশন থেকে খুব দূরে নয় হোস্টেলটা। বিশাল এলাকার ওপর প্রাচীরে ঘেরা প্রাসাদ-প্রমাণ একটি বাড়ি। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে তার লোহার গেটের কাছে গিয়ে জানল গৌতম ওটা এখন বন্ধ। খুলবে সেই সন্ধে ছটার সময়। শুনে ও একটু ঘাবড়ে গেল। এখন বাজে মাত্র এগারোটা। তার মানে আরো সাত ঘণ্টার ব্যাপার। এতক্ষণ এই মালপত্র নিয়ে কি করবে? একটু ভাবতে ভাবতে প্রাচীরের গায়ে উঁচু জায়গাটার ওপর ও বসে পড়ল।

—হ্যালো মিষ্টার! তোমারও দেখছি আমার মত অবস্থা। অনেক আগেই এসে পড়েছ?

ইংরেজীতে অপরিচিত গলাটা শুনে মুখ তুলে তাকাল গৌতম। অবাক হয়ে দেখল, একজন তরুণ ওকে সম্বোধন করেই কথাটা বলছে। এই তরুণটি হল কায়রোর সেই রাফায়োর সঙ্গী নিশাত।

—কি চিনতে পারছ না? নিশাত ওর দিকে এগিয়ে এল।

নিশাতের চেহারা ও পোশাকটা তখন পুরোদস্তুর ট্যুরিস্টদের মত। ওর গায়ে রয়েছে টুইডের স্পোর্ট জ্যাকেট, জিনের প্যান্ট ও পিঠে একটা নাইলনের রুকস্যাক।

ওকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে গৌতম আমতা আমতা করে বলল, না চিনতে পারলাম না।

নিশাত এবার হাসল।—আমিও কায়রো থেকে আসছি। তুমি আর আমি তো একই প্লেনে ছিলাম।

—ওহো তাই নাকি? গৌতমের লাজুক স্বর। আমি সত্যি দুঃখিত। প্লেনে তোমাকে লক্ষ্য করিনি। তুমি বুঝি কায়রোতেই থাক?

—হ্যাঁ। আমার নাম ইয়াসিন। মিথ্যে পরিচয় দিল নিশাত। তোমার নাম?

—গৌতম মজুমদার। আমি ইণ্ডিয়া থেকে আসছি।

মুহূর্তে আলাপ হয়ে গেল ওদের মধ্যে। অবশ্য নিশাত নিজেই যেচে এর সূত্রপাত করল। গৌতম ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না যে ওর সব কিছুই ছিল ভাণ। নিশাতের নাকি প্যারিসে এটা দ্বিতীয় আগমন। এবারও সে বেড়াতে এসেছে। তবে এবার ইয়োরোপে একটা চাকরীর সন্ধান করাই ওর উদ্দেশ্য।

আলাপ পরিচয়ের পর নিশাত হঠাৎ বলে উঠল, চলো এখানে বসে থেকে লাভ কি। ছটা পর্যন্ত যখন সময় রয়েছে একটু ঘুরেই আসি।

উত্তম প্রস্তাব। গৌতম উঠে দাঁড়াল। কিন্তু নিজের রুকস্যাকের দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তি হল ওর। এই মাল নিয়ে শহর ঘুরে বেড়ান কি অত সহজ?

নিশাতকে কথাটা বলতেই সে কাঁধ ঝাঁকাল, কোন চিন্তা নেই। চল ওটার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কি ব্যবস্থা বোঝা গেল না। তবে গৌতম ওর সঙ্গে মেট্রো স্টেশনের দিকে পা বাড়াল। মেট্রোতে চেপে যেখানে এসে নামল

সেটা প্যারিসের গার্-দ-লিঁয় রেলওয়ে স্টেশন। পাতাল থেকে মাটি ফুঁড়ে একেবারে স্টেশনের চত্বরে উঠে নিশাত গৌতমকে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে থাকে-থাকে সাজান ষ্টীল-লকারের সারি। তার মধ্যে কয়েকটার পাল্লা বন্ধ। কয়েকটা খোলা। যেগুলো খোলা তার প্রত্যেকটাতে একটা করে চাবি ঝুলছে। নিশাত একটা লকারের পাল্লা টেনে ধরতেই গৌতম দেখল ভেতরে প্রচুর জায়গা। নিজের পিঠের রুকস্যাকটা সেখানে ঢুকিয়ে সে গৌতমের রুকস্যাকটাও তার ভেতর রাখল। দুটোই ভেতরে এঁটে গেল সুন্দর। তারপর পাল্লা বন্ধ করে ঝোলান চাবিটা ঘুরিয়ে বার করে নিল।

—চল, এবার আমরা ফ্রি। চাবিটা পকেটে ঢুকিয়ে নিশাত ঘুরে দাঁড়াল। বিকেলে ফেরার পথে এগুলো বার করে নেওয়া যাবে।

—দাঁড়াও-দাঁড়াও। গৌতম লকারের সারিগুলোর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইল, এর কি কোন ভাড়া নেই ?

—নিশ্চয়ই আছে। এর ভাড়া চব্বিশ ঘণ্টার জন্য এক ফ্রাঙ্ক।

—কে নেবে সেটা ?

—কেউ নয়। লকারটা খোলার আগে কয়েনটা এর মধ্যে ফেলে দিলেই হবে। নিশাত লকারের দিকে আবার ঘুরে বুঝিয়ে দিল ওকে। চাবির গর্তের ওপর ঐ যে আর একটা গর্ত দেখছ ওখানে যতক্ষণ না এক ফ্রাঙ্ক ফেলবে ততক্ষণ এই চাবি এর মধ্যে ঘুরবে না। তার মানে পাল্লাও খুলবে না। অবশ্য এক ফ্রাঙ্ক ভাড়া কাল অবধি। তারপর খুললে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় আর এক ফ্রাঙ্ক করে ঢালতে হবে।

বাঃ বেশ ভাল জিনিস তো। গৌতমের বেশ মজা লাগল। তার মানে অটোমেটিক লকার এটা। এক ফ্রাঙ্ক ভাড়া হলেও এর উপকারিতা যে কত এখন সে বুঝতে পারছে। আজ সারাদিনের জন্য ওরা নিশ্চিন্ত, অনেক হালকা। এখন প্যারিস খুব মন প্রাণ দিয়ে ঘুরতে পারবে। এটা কম আনন্দের কথা ?

তারপর টানা অনেকক্ষণ ঘুরল ওরা। নিশাত ছিল বলে গৌতমের

সুবিধেই হল বেশ। কারণ ছেলেটার কাছে প্যারিস সত্যি খুব পরিচিত জায়গা। তাছাড়া ফ্রেঞ্চ ভাষাটাও ওর পুরো আয়ত্তে।

গার-দ-লিঁয় থেকে ওরা মেট্রোতে চড়ে প্রথমে গেল জার্দিন-দেস-তুই-লেরিয়েস অর্থাৎ তুইলেরিয়েসের বাগানে। সে এক মনোরম জায়গা। প্যারিসের মত ব্যস্ত শহরের মাঝে এ রকম যে এক শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আছে ওখানে না গেলে তা বোঝা যায় না। বিরাট এলাকা নিয়ে শুধু সবুজ গাছপালা ও রঙ বেরঙের ফুলের সমারোহ। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে প্লাস-দ-লা-কনকর্দ। মোহনীয় সব স্ট্যাচু আর সুন্দর সুন্দর ফোয়ারাতে ঘেরা যেন এক পবিত্র প্রাঙ্গণ সেটা। তার সামনেই প্যারিসের বিখ্যাত রাস্তা এভিনিউ-দ-শাম্প-এলিসিস। রাস্তাটা হাঁটতে শুরু করল ওরা। দুপাশে ছায়াময় গাছের সারি আর কাফে। তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গৌতমের এত ভাল লাগল যে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে সে একেবারে আর্ক-দ-ট্রাম্ফের ওপর গিয়ে থামল। আর্ক-দ-ট্রাম্ফ হচ্ছে নেপোলিয়নের বিজয়ের স্মৃতিতে তৈরী এক বিশাল তোরণ। এই তোরণের চারপাশে এসে মিশেছে মোট বারোটা রাস্তা।

রাস্তাগুলো গুণে একটু জিরিয়ে নিল গৌতম। এবার ওর বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

—ক্ষিদে তো আমারও পেয়েছে। গৌতমের প্রস্তাব শুনে নিশাত এদিক ওদিক তাকাল। চল কোন রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে পড়ি।

—না। গৌতম খোলাখুলি বলল, রেষ্টুরেণ্টে ঢোকার মত পয়সা আমার নেই। সস্তায় কিছু খাওয়া যায় কিনা দেখ।

ওর কথামত নিশাত বাঁদিকের এভিনিউতে ঢুকে একটা ছোট দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানটা কলকাতার চৌরঙ্গী পার্কষ্ট্রীটের বড় ষ্টেশনারী দোকানের মত। এই দোকানে পেট ভরে খাওয়ার মত কি পাওয়া যাবে গৌতমের মাথায় কিছু ঢুকল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে অবাক হতে হল। নিশাতের তত্ত্বাবধানে ঐ দোকান থেকে যা খাবার-দাবার নিয়ে বেরিয়ে এল দুজন তার মধ্যে ছিল দু প্যাকেট স্লাইসড পাউরুটি, দু'টিন রান্না করা মাছ ও দু কৌটো

ফল মিশ্রিত দই। সর্বসাকুল্যে দাম দু' ডলারেরও কম। তার মানে প্রত্যেকের লাগল প্রায় ছ টাকা করে।

একটা পার্কে বসে খাবারগুলো খেয়ে নিল ওরা। মাছের সিল্ড টিনের ওপর ছিল একটা লোহার কাঁটা লাগান। ওটা ঘোরাতেই ঢাকনাটা কেটে খুলে গেল। তার নিচে সুস্বাদু মসলা মাখান মাছ। গৌতম ব্যাগ থেকে ওর ছুরিটা বার করে সেই মাখনের মত কাঁটা বিহীন মাছগুলো দিয়ে পাঁউরুটির স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে খেল। দারুণ লাগল খেতে। তারপর ফল মেশানো দৈ। আহা পেট তো ভরলই, খেয়ে তৃপ্তিও লাগল বেশ। এর পর চাই জল। জল কোথায় পাওয়া যায়?

—জল? নিশাত শুনে বলল, তাইত জলটা তো কেনা হল না?

—তার মানে। গৌতম হতভম্ব।—আমি খাবার জলের কথা বলছি। এখানে কোথাও জলের ট্যাপ খুঁজে পাওয়া যাবে না?

—ট্যাপ। এবার হাসল নিশাত, না ভাই প্যারিসে ঐ জিনিসটি পাবে না। এখানে এমনি জল খাওয়ার রেওয়াজ নেই। তাই খাবার জলের ট্যাপও কোথাও নেই। এখানকার লোকেরা সাধারণত পিপাসা মেটায় বিয়ার বা বোতলের বিশুদ্ধ জল দিয়ে। ঐ জল একমাত্র দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়।

শুনে গৌতমের চোখ কপালে উঠল। জল কিনে খেতে হবে! এ কেমন দেশ রে বাবা? তাহলে থাক, পরেই না হয় দেখা যাবে।

পার্ক থেকে বেরিয়ে ময়লা ফেলার একটা পাত্রে মাছের টিন ও দইয়ের প্লাষ্টিক কৌটোটা ফেলে ওরা মেট্রো স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।

মেট্রো ছাড়া প্যারিসে ঘোরা যায় না। প্যারিসকে চেনাও যায় না। আজ এ শহরে এইটুকু ঘুরে সেটা বুঝতে পেরেছে গৌতম। প্যারিস শহরের মাটির তলায় নাকি একশ ষাট কিলোমিটারের ওপর এর জাল ছড়ান। মোট চোদ্দটা রুট। একটার ওপর আরেকটা আড়াআড়ি ভাবে ছুটে গেছে। কোন গন্তব্য স্থলের জন্য একটা রুট অন্তত বদল করতে হতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে সেটা একটু জটিল

মনে হলেও মেট্রো-ম্যাপ সঙ্গে থাকলে এই গাড়ি বদল করার ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। ম্যাপে বিভিন্ন রঙ দিয়ে সব রুটগুলো আলাদা আলাদা করে এমন ভাবে বোঝান আছে যে কাউকে না জিজ্ঞেস করেও তা করা যায়। তাছাড়াও বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে টিকিট ঘরের পাশে একটা করে মেট্রো লাইনের আলোকিত মানচিত্র ঝোলানো আছে। সেই মানচিত্রের তলায় গন্তব্য স্টেশনের নামধারী বোতামটা টিপলেই নির্দিষ্ট রুটের রঙিন লাইটগুলো জ্বলে ওঠে। আর তা থেকেই বোঝা যায় কোন স্টেশনে নেমে আবার কোন রুটের গাড়ি ধরতে হবে। মেট্রোর একটা টিকিটের দাম এক ফ্রাঙ্ক। দশটা এক সঙ্গে কিনলে আট ফ্রাঙ্ক। একটি টিকিট একবার ব্যবহারের জন্য। অর্থাৎ পাতালে নেমে যতক্ষণ না কেউ অন্য কোন স্টেশন দিয়ে ওপরে উঠছে ততক্ষণ এর আয়ু। তারমধ্যে হাজারবার রুট বদল করলেও কোন আপত্তি নেই। অতএব বলা বাহুল্য প্যারিসে মেট্রো যেমন দ্রুত, আরামদায়ক—তেমনি সস্তা।

সেই মেট্রোতে চেপে ওরা প্রথমে গেল গার-দ-লিঁয় স্টেশন। সেখানে লকার থেকে মাল পত্র নিয়ে তারপর ইয়ুথ হোস্টেল।

ইয়ুথ হোস্টেলের গেটের সামনে তখন ছেলে-মেয়েদের লম্বা এক কিউ। কিউটা দেখেই ওরা ছুটতে ছুটতে তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

গেট খুলল ঠিক ছটা বাজতে পাঁচে। ভেতরে বিরাট চত্বর পেরিয়ে অফিস। তারপর সবাই যে যার মেম্বার শীপ কার্ড বার করে ওদের এক রাতের আস্তানা যোগাড় করতে লাগল।

গৌতম ও নিশাত পেল দোতলার একটা টু-টায়ার বিছানা। নিশাত নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে ওর রুকস্যাকটা ওপরের বিছানায় রেখে গৌতমকে বলল, তুমি আর বেরোবে নাকি ?

—না। গৌতম জবাব দিল, আজ আর নয় এখন বিশ্রাম নেব।

—আমি বেরোচ্ছি। একটা কাজ আছে, সেরে আসি। তোমার সঙ্গে তাহলে রাতে দেখা হবে।

—ঠিক আছে। গৌতম রুকস্যাকটা মাটিতে রেখে নিজের বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল। নিশাত বেরিয়ে গেল বাইরে।

ওডিওন হোটেলটা প্যারিস ইয়ুথ হোস্টেলের কাছেই। এই হোটেলের এক সুসজ্জিত কামরায় রাফায়েো তখন বসে ছিল। ওর চিন্তিত মুখ। সকাল থেকে সিগারের পর সিগার খেয়ে হাতের আঙুলে দাগ ধরে গেছে। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। উঠে দরজা খুলে দিল সে।

নিশাত ঘরে ঢুকল।

একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস নিয়ে রাফায়েো আবার বসল কোচে। বসেই জিজ্ঞেস করল, কিছু জানা গেল ?

—হ্যাঁ। নিশাত ওর সামনের কোচে বসে বলল, সারাদিন ওর সঙ্গে ঘুরে অনেক কায়দা করে কথাটা জানতে পারলাম। ছেলেটা এখান থেকে রোম যাবে। ওখানে নাকি কাউকে একটা জরুরী চিঠি দেবার আছে। অবশ্য চিঠিটা ওকে কে দিয়েছে তা আমি আর জিজ্ঞেস করিনি।

—ভাল করেছ। রাফায়েো কোচে গা এলিয়ে বলল, ওটা যে জামিলেরই দেওয়া এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

—তাহলে কি ফ্রেডরিক রোমে আছে ?

—অসম্ভব কিছু নয়। রাফায়োর চিন্তিত স্বর। আমার মনে হয় কায়রোতে জামিলের ওপর আমরা এত নজর রেখেছিলাম বলেই কাজটা ওরা এই ছেলেটিকে দিয়ে করাতে চায়।

—তার মানে, নিশাত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। এই ছেলেটা কি সব জানে ?

—না। তা হয়তো নয়। রাফায়েো সিগারের ছাই ঝেড়ে আস্তে আস্তে বলল, এ রকম একটা ব্যাপার ঐটুকু ছেলেকে কিছুতেই বলা যায় না। হাজার লোভ দেখিয়েও না। তবে ওরা নিশ্চয়ই এই ছোঁড়াটিকে কোন মতে একবার ফ্রেডরিকের খপ্পরে পাঠাতে চায়। যাতে ফ্রেডরিক নিজেই ওর কাজ একে দিয়ে হাঁসিল করে নিতে পারে।

—তাহলে ? এখন আমাদের কি করতে হবে ?

—সোজা ব্যাপার। এই ছোঁড়াটির কাছ থেকে জামিলের চিঠিটা কোন মতে গাপ করা। তবে হ্যাঁ কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে। ছোঁড়াটাকে চটালে চলবে না। কারণ ওকে আমাদেরও প্রয়োজন।

—ঠিক আছে। নিশাত উঠে দাঁড়াল। তুমি নিশ্চিন্তে থাক। আজ রাতেই কাজটা আমি সেরে ফেলব। তুমি কি কায়রোতে ফোন করেছিলে ?

—হ্যাঁ করেছিলাম। রাফায়েো নিশাতকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে বলল, ওদিকে সব ঠিক আছে। আমরা যে কায়রো ছেড়ে চলে এসেছি ওরা এখনও টের পায়নি। ইদরিস বলল চিন্তার কিছু নেই ও নজর রেখে চলেছে।

নিশাত বেরিয়ে যাবার পর আধ ঘণ্টা খানেক বিছানায় শুয়ে ছিল গৌতম। তারপরেই উঠে পড়ল। বিদেশে এসে ক্লান্তি যতই থাকুক না কেন শুয়ে থাকতে মন চায় না। তাই ও মুখ হাত ধুয়ে মা-বাবাকে একটা চিঠি লিখে নিচে নেমে কমনরুমে বসে টিভি দেখছিল।

এরমধ্যে ওর সমবয়সী এক অষ্ট্রেলিয়ান ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। ছেলেটির নাম এণ্ডারসন। ব্রিসবেনে কলেজে পড়ে। এণ্ডারসন নাকি ওর মা বাবার সঙ্গে দুবছর আগে ভারতবর্ষে বেড়াতে গিয়েছিল। সেই সূত্রেই ওদের আলাপ।

টিভি প্রোগ্রামটা কিছুক্ষণ দেখে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে ঘাস বিছান বিরাট লন। তার পাশে সিমেন্টের চত্বরের ওপর নানা দেশের ছেলে মেয়ে বসে গল্প করছে, কেউ ইজরায়েলের কেউ জাপানের, কেউ সুদূর আর্জেন্টিনা থেকে এসেছে। ওদের মধ্যে ওরাও গিয়ে বসল।

এই প্যারিস ইয়ুথ হোস্টেলটা আকার ও এলাকায় বিরাট। মোট দুটো বাড়ি। একটা মেয়েদের জন্য আরেকটা ছেলেদের। প্রায় তিন

চারশ ছেলে মেয়ের থাকার জায়গা এখানে। খুব সুন্দর ব্যবস্থা। ডরমিটরি সিস্টেম হলেও ফোমের নরম বিছানা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম-স্নানাগার, সস্তায় খাবার ক্যান্টিন, টিভি সমেত কমনরুম, অটোমেটিক লকার, কি নেই? এমন কি অফিস ঘরের সামনে টুকটাক খাবারের জন্য দুটো অটোমেটিক মেশিন পর্যন্ত রয়েছে। তার একটাতে পয়সা ফেললে কফি বা ঠাণ্ডা পানীয় কিছু পাওয়া যায়। আরেকটা থেকে বেরিয়ে আসে কেক টফির মত শক্ত খাদ্য। মাত্র এক ডলারেরও কমে প্যারিসের মত জায়গায় এত সুবিধের কথা ভাবা যায় না। কায়রোর হোস্টেলে এত কিছু না থাকলেও ওখানকার ব্যবস্থাও ভারতবর্ষের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড হোটেলের চেয়ে কিছু কম নয়। যুবক যুবতীদের জন্য দেশে দেশে ইয়ুথ হোস্টেল ফেডারেশনের এই ব্যবস্থা সত্যিই খুব প্রশংসনীয়।

এণ্ডারসনও তাই বলছিল। ও গতবার জাপান ঘুরে এসেছে সেখানেও নাকি এ রকম চমৎকার ইয়ুথ হোস্টেলের ছড়াছড়ি।

গৌতম শুনে মনে একটু কষ্ট পেল। ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা কেন যে নেই ও বুঝতে পারল না।

এণ্ডারসন গল্প করতে করতে হঠাৎ গৌতমের হাতে পোর্ট ফোলিও ব্যাগটা দেখে বলল, বাঃ সুন্দর ব্যাগ তো। এটা কি ইণ্ডিয়ার তৈরী?

—হ্যাঁ। এর নাম শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। গৌতমের জবাব।

—সত্যি খুব সুন্দর। ব্যাগটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে সে বলল, আমি কিন্তু ভারতবর্ষে যখন গিয়েছিলাম এ রকম ব্যাগ দেখিনি।

—তুমি কি কলকাতায় গিয়েছিলে?

—না। দিল্লী আগ্রা আর জয়পুর।

—সে জন্যই দেখনি। কলকাতায় গেলে ঠিক নজরে পড়ত।

ওরা গল্প শেষ করে রাত নটা নাগাদ উঠে পড়ল। এণ্ডারসন চলে গেল ওর ঘরে, গৌতম রাতের খাবার খেতে ক্যান্টিনে।

ক্যান্টিনে খেতে খরচ লাগল চার ফ্রাঙ্ক। অর্থাৎ প্রায় এক ডলার।

পাওয়া গেল পাউরুটি, সুপ ও ভেড়ার মাংস। খাবারটা পুষ্টিকর বটে কিন্তু স্বাদ মোটেই সুবিধের নয়। এর চেয়ে দুপুরের খাওয়া আরো জমেছিল বেশ। খেয়ে দেয়ে আবার সেই জলের জন্য এদিক ওদিক তাকাল গৌতম। কিন্তু বৃথাই ওর তাকান। এখানে সত্যি কাউকে সে জল খেতে দেখল না।

অতএব ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে দোতলায় এসে গুটি গুটি সে বাথরুমে ঢুকল। তারপর প্রায় লুকিয়েই বেসিনের ট্যাপ থেকে আকণ্ঠ জল পান করে সোজা বিছানা। সেখানেই দেখা হল নিশাতের সঙ্গে।

নিশাত ওকে দেখা মাত্র অনুযোগ করে উঠল। ও নাকি তখন থেকে খুঁজছে ওকে।

বিছানায় বসে বসে ওরা আরো কিছুক্ষণ গল্প করল।

গল্পের মধ্যেই নিশাত জিজ্ঞেস করল গৌতমকে। —রোমে তুমি কবে যাবে?

—কাল রাতেই। গৌতম জবাব দিল। আজ তোমার সঙ্গে প্যারিসের অনেক জায়গা ঘুরে নিলাম। কাল দেখব নতরদাম গির্জা, আইফেল টাওয়ার আর লুভর্ মিউজিয়াম। প্যারিসের বাকিটুকু ফেরার পথে ঘোরা যাবে। কারণ ইয়োরোপের যেখানেই যাই বাড়ি ফেরার জন্য প্লেনে উঠতে আবার এখানে আমাকে আসতেই হবে।

রাত দশটার একটু পরে শুয়ে পড়ল ওরা। ক্লান্ত গৌতমের চোখে ঘুম আসতে দুমিনিটও লাগল না। কিন্তু নিশাত জেগেই রইল।

রাত দশটার পর হল এগারোটা, বারোটা তারপর একটা। সারা ইয়ুথ হোস্টেল তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। বাইরে রাস্তা থেকে শুধু তীব্র বেগে গাড়ি ছুটে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। নিশাত নিঃশব্দে উঠে বসল বিছানায়। চারদিকে সতর্ক চোখ বুলিয়ে ধীরে ধীরে নামল খাট থেকে। গৌতমের রুকস্যাকটা ওর মাথার কাছেই মাটির ওপর পড়ে ছিল। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশাত ওটা আলতো ভাবে তুলে নিল হাতে। তারপর বাইরের করিডোরের আলোয় বেরিয়ে গেল।

প্রায় আধঘন্টা ধরে রুকস্যাকটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল নিশাত। কিন্তু জামিলের দেওয়া কোন খাম বা চিঠির হদিস পেল না। আর একবার ভাল করে সব খুঁজেও সে হতাশ হল। শেষ পর্যন্ত ঘরে ঢুকে ওটা যথাস্থানে রেখে গৌতমের পাসপোর্ট ব্যাগের জন্য বিছানার এদিক ওদিক হাতড়ালো। শিয়রের আশে পাশে ওটা কোথাও না পেয়ে বালিশটা যেই একটু সে তুলতে যাবে গৌতম জেগে গেল।

আধো আধো ঘুমন্ত চোখে তাকিয়ে সে বলল, কি ব্যাপার, কি খুঁজছ তুমি ?

—কিছু না। অপ্রস্তুত হলেও নিমেষেই নিজেকে সামলে নিল নিশাত। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমার ঘড়িটা ওপর থেকে এখানেই পড়ল মনে হয়। তাই দেখছি।

গৌতম উঠে বসল বিছানায়। সেও খুঁজতে লাগল। নিশাত হঠাৎ নিচু হয়ে ওর বাঁ হাত থেকে ঘড়িটা খুলে বলল, ও এইতো পেয়ে গেছি। যাক তুমি ঘুমোও। আমি খুব দুঃখিত। তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।

গৌতম আবার শুয়ে পড়ল। নিশাতও উঠে পড়ল ওর বিছানায়।

খুব সকালে ইয়ুথ হোস্টেলের কাছ থেকে রাফায়েকে ফোন করল নিশাত। এখনো কিছু পাওয়া যায়নি। আরো দেখতে হবে। তুমি হোটেলেই সারাদিন থেকো। আমি সময় মত আসব।

গৌতম ক্যান্টিনে বসে তখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল। কালকের সেই অষ্ট্রেলিয়ান ছেলেটি ওর সামনে বসে।

টুকটাক কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে। তিনদিন প্যারিসে কাটানোর পর ছেলেটা আজ ফ্রাঙ্কফুর্ট চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে যাবে মিউনিখ। ওর যাত্রার বাহন হচ্ছে একমাত্র রেল। ওর কাছ থেকেই জানতে পারল গৌতম ইয়োরোপের রেল কোম্পানীগুলো সারা ইয়োরোপের জন্য ট্যুরিস্টদের কাছে ইয়োরেলপাশ বিক্রি করে। এই টিকিটে রেলে করে ইয়োরেপের সর্বত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্য ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে। একুশদিনের জন্য এরকম একটি ফার্ষ্টক্লাসের টিকিটের দাম

একশ দশ ডলার। এক মাসের জন্য একশ চল্লিশ ডলার। আর ষ্টুডেন্ট হলে তো কথাই নেই। এণ্ডারসন ছাত্র বলে সে তুমাসের ষ্টুডেন্ট রেল পাশ কিনেছে একশ পঁচিশ ডলারে। অবশ্য সেটা সেকেণ্ড ক্লাসের। তার মানে সে টানা ষাট দিন রেলে করে ইয়োরোপের যে কোন দেশের যে কোন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। এর জন্য ওর গাঁট থেকে আর একটি পয়সাও লাগবে না। সত্যি দেশ দেখানোর কি সুন্দর ব্যবস্থা।

—তুমি যদি কিছু মনে না কর একটা কথা বলি? এণ্ডারসন হঠাৎ টেবিলের এক পাশে পড়ে থাকা গৌতমের পোর্টফোলিও ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার ঐ ব্যাগটা আমার খুব নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার মা দেশ বিদেশের চামড়ার জিনিস সংগ্রহ করেন। ওটা ওঁকে দিলে যা খুশি হবেন। তুমি আমার এই ব্যাগের সঙ্গে ওটা পালটে নেবে?

গৌতম ছেলেটির প্রস্তাব শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল। ওর এই ব্যাগটার আর এমন কি দাম। বড় জোর আট কি দশ টাকা। কিন্তু তার বদলে ছেলেটি যে ব্যাগটা ওকে দিতে চাইছে সেটা খুবই দামী। কালো চামড়ার তৈরী নাম করা কোন কোম্পানীর হবে।

—তুমি ঐ ব্যাগটার সঙ্গে এটা চেঞ্জ করবে? গৌতম মৃদু হেসে বলল, ঠকে যাবে। এটার দাম কত জান?

এণ্ডারসন হো হো করে হেসে উঠল।—দাম দিয়ে এ সবের বিচার কর না। তা যদি বল তোমার ঐ ব্যাগটা অনেক বেশি দাম দিয়েও এখানে আমি পাব না। অথচ আমার এই ব্যাগ এখানে অঢেল আছে। আবার আমার দেশেও এর কোন কমতি নেই। কিন্তু ঐ ব্যাগটা আমার মার কাছে সত্যি একটা তুর্লভ জিনিস।

অগত্যা ব্যাগ বিনিময় করতেই হল। অবশ্য এতে গৌতমেরই লাভ হল বেশি। একটা ঝকঝকে সুন্দর বিদেশী ব্যাগ পেয়ে গেল সে। কিন্তু এর জন্য এণ্ডারসনের মুখের ভাব তখন দেখবার মত। শান্তি-নিকেতনী ব্যাগটা পেয়ে খুশিতে সে প্রায় আটখানা।

গৌতমকে বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে তার একটু পরেই সে বিদায় নিল। কারণ ওকে এখন ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেন ধরতে হবে।

ও বেরিয়ে যাওয়া মাত্র নিশাত পৌঁছল সেখানে। নিশাত ভোরে উঠেই গৌতমকে বলে রেখেছিল আজও সে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরোবে। ওর ব্রেকফাষ্ট একটু আগেই হয়ে গেছে।

দুজন মিলে তারপর হোস্টেলের স্টোর রুমে গেল। গৌতম সেখানে অটোমেটিক লকারে নিজের রুকস্যাকটা রাখতেই নিশাত বলে উঠল, আমারটা সঙ্গেই থাক। বিকেলে এদিকে নাও আসতে পারি।

—তোমার অসুবিধে হবে না? গৌতম জিজ্ঞেস করল।

—না। তেমন কোন অসুবিধে হবে না।

লকারের পাল্লাটা বন্ধ করে দিল সে। নিশাত তখনই ওর হাতে নতুন ব্যাগটা দেখে বলল, সেকি তোমার ঐ ব্যাগটা কোথায়?

হাসল গৌতম।—ওটা এখন ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর পথে।

তারপর বাইরে যেতে যেতে ব্যাগ বদলের ঘটনাটা ওকে বিশদ ভাবে সে বলল।

সেদিন ওরা প্রথমে গেল নতরদামের গির্জা দেখতে। এই প্রকাণ্ড গির্জাটা আটশ বছরেরও আগে গোথিক মার্ভেলে তৈরী। এর বিস্ময়কর কারুকার্য্য করা দেয়াল-দরজা-জানলাগুলো তখনকার উন্নত স্থাপত্য শিল্পের এক বিরল নিদর্শন। এর প্রশান্ত পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে ভীষণ ভাল লাগল গৌতমের।

তারপর ওরা মেট্রোতে চেপে গেল আইফেল টাওয়ারে। গতকাল কনকর্দ ও শাম্প এলিসিস এভিনিউতে বেড়াতে বেড়াতে এই টাওয়ারটা দূর থেকে অনেকবার দেখেছিল গৌতম। খুব পরিচিত দৃশ্য। কতবার কত ছবিতে যে এটা নজরে পড়েছে তার হিসেব নেই। আজ তার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতেই ওর বুক আনন্দে নেচে উঠল।

টাওয়ারের চারদিকে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান। পৃথিবীর নানা দেশের লোক এখানে এসে জড়ো হয়েছে। কেউ মাথা তুলে বিভোর

হয়ে এই বিশালাকার লোহার অপরূপ কাঠামোটাকে দেখতে ব্যস্ত। কেউ সঙ্গীদের নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে শুধু ফটোর পর ফটো তুলে যাচ্ছে। আবার ওদিকে শয়ে শয়ে লোক ছুটে চলেছে ওপরে ওঠার টিকিট কাটতে।

ওরাও টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। টাওয়ারের মোট তিনটে স্তর। তবে সবচেয়ে নিচেরটাতে উঠতে কম পয়সা লাগে। লিফটে দু ফ্রাঙ্ক। সিঁড়িতে এক ফ্রাঙ্ক।

নিশাত সিঁড়িতে ওঠার আগে ওপরের দিকে তাকিয়ে গৌতমকে হেসে বলল, পারবে তো ?

—নিশ্চয়ই। গৌতম এগিয়ে গেল।—পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস আমার আছে।

কিন্তু পাহাড়ে চড়া আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠা কি এক ? আইফেল টাওয়ারের প্রথম স্তরটাই যে এত উঁচু গৌতমের জানা ছিল না। অর্ধেক পথ গিয়েই সে হাঁপিয়ে উঠল। ওদিকে নিশাত তখন দিব্যি পিঠে ওর ভারি রুকস্যাকটা নিয়েও টুকটুক করে হেঁটে চলেছে, অবশ্য ওপরে উঠে সেও বেশ হাঁপাতে লাগল।

ওপরটা লোহার মোটা মোটা রেলিঙ দিয়ে ঘেরা চৌকো একটা চত্বর। সেখানে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার আগেই ক্লান্ত দুজন ধপ করে লোহার পাটাতনের ওপর বসে পড়ল।

নিশাত একটু জিরিয়ে ওর রুকস্যাকের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে গৌতমকে বলল, তুমি ভাই ঘুরে ঘুরে দেখ। আমার এখানে দুবার আসা হয়ে গেছে। আমি ততক্ষণ একটা চিঠি লিখে নিই।

গৌতম উঠে দাঁড়াল। ও সামনের রেলিঙের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই নিশাত ওর কালো ব্যাগটাকে ধরে হঠাৎ বলে উঠল এটা একটু দাওতো।

নেহাত সামান্য অনুরোধ। ব্যাগটা দিল গৌতম। ওর ওপর কাগজটা রেখে নিশাত ওর চিঠি লিখতে শুরু করল।

গৌতম এবার এগিয়ে গেল সামনে।

আইফেল টাওয়ারের ওপর থেকে প্যারিসের দৃশ্য যে এত সুন্দর না দেখলে বোঝা যায় না। সামনেই সীন নদী। তার ওপর ব্রিজের পর ব্রিজ। হাজার হাজার গাড়ি আসছে যাচ্ছে। এদিক ওদিক প্রাসাদের পর প্রাসাদ। পেছন ধারে ঘর বাড়ির যেন এক নিঃসীম সমুদ্র। দেখতে দেখতে সেই দিকেই সরে গেল গৌতম।

নিশাত এই সুযোগই খুঁজছিল। গৌতম লোহার ফ্রেমের আড়ালে সরে যেতেই কালো ব্যাগের ঢাকনাটা সে খুলে ফেলল। দ্রুত নিপুণ ওর হাত। ভেতরের কাগজপত্রগুলো দেখতে বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু কোথায়, চিঠিটা তো এর মধ্যেও নেই! নিশাত ঝড়ের বেগে গৌতমের পাসপোর্ট ও ছোট বড় ট্যুরিস্ট বইয়ের প্রতিটি পাতা ঘেঁটে দেখল। কিন্তু কোথাও জামিলের দেওয়া চিঠির হদিস পাওয়া গেল না। এবার ভীষণ অবাক হল সে। তাহলে চিঠিটা গেল কোথায়। রুকস্যাকে নেই, ব্যাগে নেই। তাহলে কি গৌতম ওটা নিজের পকেটে রেখেছে? তা কি করে সম্ভব? সব দরকারী কাগজপত্র যখন এই ব্যাগেই চিঠিটা সে আলাদা ভাবে নিয়ে ঘুরবে কেন। নিশাত কিছু বুঝতে পারল না। দমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল।

ঘণ্টা খানেক আইফেল টাওয়ারে কাটানোর পর নিচে নেমে ওরা আবার মেট্রোতে চেপে গেল পৃথিবী-বিখ্যাত লুভর্ মিউজিয়াম দেখতে।

যদিও গৌতম আর্টের বিশেষ কিছু বোঝে না তবু ফ্রান্সের মহান চিত্রকার দ্য ভিন্সির মোনালিসার কথা শুনেছে সে। সেই মোনালিসার ছবির সাথে আরো কিছু কলা প্রদর্শন যেমন ভেনাস দ্য মেল ও উয়িংগ্‌ড ভিক্টরি এই মিউজিয়ামেই রয়েছে। কিছু না বুঝলেও সুন্দর সুন্দর চিত্র, ভাস্কর্য্য ও নানা রকমের প্রাচীন সংগ্রহের এই ভাণ্ডার দেখতে ওর লাগল পুরো দু-ঘণ্টা। তখন দুপুর দুটো। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে গত কালের মতো দোকানের খাবার কিনে লাঞ্চটা

একটা পার্কেই সেরে ওরা নেপোলিয়ান টুম্ব দেখতে চলল। সেখান থেকে ভার্সাইলের প্রাসাদ।

সব ঘুরে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওরা এল গার-দ-লিঁয় স্টেশন। রোমের ট্রেন যেখান থেকে ছাড়ে। গতকাল এই স্টেশনের মূল ভবনে ঢোকেনি গৌতম। আজ ঢুকে ও মুগ্ধ হয়ে গেল।

রেলের স্টেশন বলতে ওর চোখ যা দেখতে অভ্যস্ত তার ছিটে ফোঁটাও নেই এখানে। নেই লোকের তেমন ভিড়। নেই কুলিদের আনাগোনা। নেই ফেরিওয়ালার কোন অস্তিত্ব। তার পরিবর্তে চারপাশে সাজানো গোছানো ছিমছাম পরিবেশ, কাঁচে ঘেরা এনকোয়ারী অফিস, ঝকঝকে তকতকে টিকিট কাউন্টার, আরাম-দায়ক সোফা লাগান ওয়েটিংরুম, আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া ও তারই সাথে স্টেশনের প্রায় সব সময় খোলা ট্যুরিস্ট ডেস্ক। সব আয়নার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লোকগুলোও চমৎকার। যেমন সদা হাস্যময় তেমনি সাহায্যকারী।

গৌতম এনকোয়ারী অফিসে রোমের ট্রেনের কথা জিজ্ঞেস করতেই চটপট উত্তর পেল। ট্রেন ছাড়বে রাত সাতটা পঞ্চাশে। রোমে পৌঁছবে পরের দিন দুপুর দেড়টায়। সময়টা জেনে কাউন্টারে এসে টিকিটও কেটে নিল গৌতম। লাগল দেড়শো ফ্রাঙ্ক। অর্থাৎ সাতাশ ডলারের মত।

টিকিটটা কাটতেই হঠাৎ ওর মনে হল, ট্রেনটা কত নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে সেটা এনকোয়ারীতে জিজ্ঞেস করা হয়নি। প্রশ্নটা এখানেই করল সে। কিন্তু সেই ভাষার অবরোধ। কাউন্টারের ভদ্রলোক ইংরেজী একবর্ণও বোঝেন না। নিশান্ত তখন ওকে সরিয়ে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করল।

—নফ্ নফ্। এক গাল হেসে উত্তর দিলেন তিনি। নিশান্ত ঘুরে গৌতমের হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে নিজের পেন দিয়ে তার পেছনে প্লাটফর্ম নাম্বারটা লিখে দিল। নাম্বার নাইন।

ওরা স্টেশনের বাইরে চলে এল এবার। নিশাত গৌতমের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, তাহলে চলি দোস্ত। এবার বিদায়।

—তুমি হোস্টেলে ফিরবে না? গৌতম হাতে হাত রেখে বলল।

—না আজ আর ওখানে থাকছি না। যাচ্ছি এক বন্ধুর কাছে তারপর দেখব কি করা যায়।

—তোমাকে ছাড়তে আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না। তুমি এ দুদিন আমার সঙ্গে থেকে যা উপকার করলে তার তুলনা হয় না। তোমাকে আরো সঙ্গে পেলে ইয়োরোপ দেখা আমার কত সহজ হয়ে যেত।

—এতো ভাবছ কেন? নিশাত হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, পৃথিবী গোল। আমাদের দেখা আবার হয়েও যেতে পারে।

—তার মানে? তুমিও রোমে আসছ নাকি?

—বলা যায় না। চিন্তিত নিশাত আনমনা স্বরে বলল, দেখি কি হয়। আচ্ছা গুড বাই।

—গুড বাই।

নিশাত চলে গেল ডান ধারে, গৌতম এগলো মেট্রোর সিঁড়ির দিকে।

হোটেল ওডিয়ন।

রাফায়োর ঘরে গম্ভীর মুখে ঢুকল নিশাত।

—চিঠির সন্ধান কিছু পাওয়া গেল না। ছেলেটার সব কিছুই ভাল করে দেখলাম। কিন্তু ওর রুকস্যাক ব্যাগ কোনটাতেই ওটা নেই।

—তাহলে কোথায় আছে? রাফায়ো গুম হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—আমার মনে হয় জামিল নিশ্চয়ই ওকে এ ব্যাপারে খুব সাবধান করে দিয়েছে। নিশাত জবাব দিল। ওটা হয়তো ও পোশাকের ভেতর কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তা না হলে আমি এত খুঁজেও পাব না কেন।

—তাহলে প্যারিসে কিছুই করা গেল না?

—না। ওকে রোম পর্যন্তই ফলো করতে হবে। আজ রাত সাতটা পঞ্চাশে ওর ট্রেন।

—ফলো তো করতেই হবে। রাফায়ো ওর সিগারে দাঁতের কামড় বসিয়ে রুক্ষ স্বরে বলল, ভেবেছিলাম ছেলেটাকে ঘাঁটাব না। এখন দেখছি দরকার হলে চিঠিটার জন্য ওকে কয়েক ডোজ ওষুধও দিতে হতে পারে।

রাফায়ো আর কিছু না বলে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

নিশাতের দৃষ্টিতেও তখন গভীর চিন্তা।

ওডিয়ন হোটেলে ওদের মধ্যে যখন এসব কথা বার্তা চলছে, গৌতম তখন হোস্টেলে ফিরে বন্ধ লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। গেটটা আর মিনিট দশেক পর খুলবে। গেটের সামনে এখন কালকের মতই, লম্বা কিউ। তার মধ্যে গত কালেরও কয়েকজন ছেলে মেয়ে রয়েছে। কারণ ইয়ুথ হোস্টেলগুলোতে রোজকার সিট রোজ সংগ্রহ করতে হয়। আজ যদি এখানে থাকত গৌতম ওকেও আবার লাইনে দাঁড়াতে হত। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। এখন শুধু রুকস্যাক নিতেই ও এখানে এসেছে।

যথা সময় গেট খুলতেই ও ভেতরে ঢুকল।

সেখান থেকে রুকস্যাকটা নিয়ে বাইরে এসে কিছু খাবার খেয়ে স্টেশনে যখন পৌঁছল তখন ঘড়িতে সাতটা কুড়ি।

সময়টা দেখেই গৌতম ছুটতে ছুটতে ন নম্বর প্লাটফর্মের সামনে এল। কিন্তু একি, প্লাটফর্মতো একেবারে ফাঁকা। কোন গাড়ি নেই কোন যাত্রী নেই। গৌতম একটু ভড়কে গেল। আশে পাশে রেলের কোন কর্মচারীও নেই যে জিজ্ঞেস করবে। অথচ আর আধঘন্টা পরেই ট্রেনটা ছাড়ার কথা। তাহলে কি প্লাটফর্মটা ভুল। গৌতম এনকোয়ারীর দিকে ছুটল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। রোমের ট্রেন ন নম্বর প্লাটফর্ম থেকেই ছাড়বে। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

কথাগুলো বললেন একজন ভারতীয় ভদ্রলোক। তিনিও এনকোয়ারীতে কি যেন জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন। গৌতম প্রথমে লক্ষ্য করেনি। ওর ইংরেজী প্রশ্নের উত্তর এনকোয়ারীর ভদ্রলোকটি না দিয়ে তিনি যখন দিলেন তখনই ওর দৃষ্টি গেল।

ভারতীয় দেখেই মুখে আনন্দের হাসি আনল সে। কাছে এগিয়ে উত্তর দিল।—রোম যাচ্ছি। আপনি এখানে থাকেন ?

—হ্যাঁ। আমার নাম নাইডু।

আলাপ হতে বেশিক্ষণ লাগল না। কারণ ভারতীয় বলে দুজনেই দুজনের প্রতি উৎসাহিত। নাইডু এখানে নাকি বছর খানেক হল একটা চাকরি নিয়ে এসেছেন। কি এক কাজে এখন রোমে যাচ্ছেন। গৌতমের কথা শুনে ভদ্রলোক তো রীতিমত থ। ঐটুকু ছেলে একা ইয়োরোপ বেড়াতে এসেছে ? আশ্চর্য !

—চল এখানে দাঁড়িয়ে গল্প না করে ওয়েটিং রুমে বসি। নাইডু ওর বড় সুটকেসটা মাটি থেকে তুলে ওকে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াল।

ওর কাছ থেকেই জানল গৌতম এখানে রেলে নাকি তেমন ভিড় হয় না। রোমের মত দূরত্ব লোকেরা সাধারণত প্লেনে বা নিজেদের মোটরেই সারে। ট্রেনে খুব কম লোক চড়ে। তাই যাত্রীরা ভারত-বর্ষের মত এক ঘণ্টা আগে স্টেশনে এসে ভিড় করে না। সাতটা পঞ্চাশের ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকবে বড় জোর সাতটা চল্লিশে। যাত্রীরাও সেই অনুযায়ী আসতে শুরু করবে। হয়তো তার দু-পাঁচ মিনিট আগে। এখানে সব কিছুই চলে ঘড়ির কাঁটার মত। মেট্রো, বাস, ট্রেন তার সঙ্গে মানুষও। সেজন্যই ন নম্বর প্লাটফর্মটা এখন ফাঁকা। নাইডু তাড়াতাড়ি এসেছেন এদিকে একটা অন্য কাজ ছিল বলে।

ওরা ওয়েটিংরুমে বসে গল্প করতে শুরু করল।

সাতটা তিরিশের একটু আগে রাফায়ো আর নিশাত স্টেশনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল।

রাফায়োর হাতে একটা ছোট এটাচি। নিশাতের হাতে ট্রাভেলিং ব্যাগ। কিন্তু এ নিশাত কিছুক্ষণ আগেকার রুক্ষ সার্ট-প্যান্ট পরা ট্যুরিস্ট নিশাত নয়। ওর পরনে এখন দামী স্যুট, পায়ে ভারী জুতো মুখে চাপ দাড়ি। তার ওপর গালে একটা মস্ত কালো জড়ুল। অর্থাৎ বেশ ও চেহারা দুটোই ওর পুরোপুরি পালটান। যাতে গৌতম ওকে দেখলেও কিছুতেই চিনতে না পারে।

স্টেশনের ভেতর ঢুকে ওরা চারপাশে একবার তাকাল।

তারপর রাফায়ো বলল, আমি টিকিট দুটো কেটে আনছি। তুমি প্লাটফর্মে যাও ছোঁড়াটার ওপর নজর রাখ।

রাফায়ো টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতেই নিশাত পা বাড়াল। ধীরে ধীরে ন নম্বর প্লাটফর্মের মুখে এসে দেখল ভেতরে তখন নাম মাত্র লোক, কিন্তু তার মধ্যে গৌতম নেই। নিশ্চিন্ত হবার জন্য আর একটু এগিয়ে সে প্রত্যেককে লক্ষ্য করে নিল। গৌতম ওর নজরে পড়ল না। তার মানে ছেলেটা এখনও এসে পৌঁছয়নি। গেটে ফিরে এবার সে এক কোণে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

মিষ্টার নাইডুর সঙ্গে বেশ জমে উঠেছিল গৌতমের। মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয় কিন্তু ভদ্রলোক খুব মিশুকে। গৌতমের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলেন। ভদ্রলোক ওকে বললেন, রোমে তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাবো জায়গাটা। ওখানে আমাকে কাজে প্রায়ই যেতে হয়। আমার সব চেনা। তুমি উঠবে কোথায়?

—ইয়ুথ হোস্টেলে। গৌতম জবাব দিল।

—তার মানে সেখানে রাতে তোমার রিপোর্ট করতে হবে তাইতো?

—হ্যাঁ, সন্ধে ছটার মধ্যে পৌঁছলেই হবে।

—ভালো কথা। তুমি তাহলে এখন থেকে কাল সন্ধে অবধি আমার সঙ্গী। এর মধ্যেই আমি তোমাকে দু একটা জায়গা দেখিয়ে দেব। কাল দুপুর দেড়টায় আমরা রোমে পৌঁছচ্ছি। তারপরেই আমি যাব টিভোলির দিকে। কাজটা আমার সেখানেই। টিভোলির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?

গৌতম একটু আমতা আমতা করে বলল—শুনেছি। কিন্তু ব্যাপার হল, কাল রোমে নেমেই আমাকে একটা জরুরী কাজ করতে হবে। সেটা না সেরে আমি যে কোথাও যেতে পারবো না।

—কি কাজ?

—একটা জরুরী চিঠি কাল বিকেলের মধ্যেই রোমের এক ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

—কোথায় থাকেন তিনি?

গৌতম ওর পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলল। জামিলের দেওয়া খামখানা বের করে ঠিকানাটা সে ভদ্রলোককে দেখাতে চাইল।

কিন্তু কোথায় সে খাম? ব্যাগটা হাতড়ে থমকে গেল গৌতম। সেই খাম ভেতরে নেই। আবার দেখতে গিয়ে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল ওর। সর্বনাশ, খামটা তো ওর হাতছাড়া হয়ে গেছে! ওটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগের ভেতর একটা চোরা পকেটে ছিল না? তাইতো! গৌতম স্তব্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণে ওর খেয়াল হল, এণ্ডারসনের সঙ্গে ব্যাগ বদল করার সময় ওর নিজের ব্যাগ থেকে সব কিছু বের করে নিলেও ঐ খামটার কথা সে একবারও ভাবেনি। তার মানে ওটা সেই ব্যাগের ভেতরেই রয়ে গেছে।

গৌতম স্থির হয়ে বোবার মতো নাইডুর দিকে তাকিয়ে রইল।

—কি হলো? তুমি কিছু হারিয়েছ বলে মনে হচ্ছে। নাইডু ওর মুখের অবস্থা দেখেই ব্যাপারটা আন্দাজ করলেন।

—হ্যাঁ হারিয়েছি। ঐ চিঠিটাই হারিয়ে ফেলেছি। গৌতম বিড়বিড় করে উঠল। নিজের ওপর তখন ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ কি দায়িত্বহীন ছেলে সে। একজনের একটা জরুরী কাজের

ভার নিয়ে এতটা অসাবধান হওয়া সত্যি খুব লজ্জার কথা। ভদ্রলোককে কথা দিয়েছিল গৌতম। এমন কি এর জন্য ওর কাছ থেকে কিছু টাকাও নিয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা কায়রোতে যে ওর এত সাহায্য করল এই চিঠিটা হারিয়ে তার হয়ত সাংঘাতিক ক্ষতিই করে বসল সে।

অস্বস্তিতে উসখুস করে উঠল গৌতম। চিঠিটা কি এখন উদ্ধার করা যায় না? এণ্ডারসন আজ সকালেই ফ্রাঙ্কফুর্ট রওনা হয়ে গেছে। তার মানে কাল পর্যন্ত ও সেখানে থাকবে নিশ্চয়ই। কথাটা ভাবামাত্র নাইডুকে বিনীত স্বরে বলল, আমার একটা উপকার করবেন?

—নিশ্চয়ই বলো।

—রোম যাওয়া আপাতত আমায় বাতিল করতে হবে। ব্যাগ থেকে রোমের টিকিটটা বের করে গৌতম বলল, এই টিকিটটা কি করে ফেরত দেওয়া যায় জেনে বলবেন একটু।

ঘড়ির দিকে তাকালো নাইডু। সাতটা তিরিশ। গৌতম যে কোন মুশকিলে পড়েছে সেটা তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন। তবে সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস না করে বললেন, টিকিটটা দাও। ফেরত দেওয়ার আগে একবার দেখে নিই ওটা কাউন্টারে কেউ কেনে কিনা।

টিকিটটা দিল গৌতম।—আর একটা কথা। ফ্রাঙ্কফুর্টের কোন ট্রেন এখন আছে কিনা সেটাও একটু জানতে হবে।

—কেন, তুমি ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে নাকি? নাইডু জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, ঐ চিঠির খোঁজে ওখানেই আমাকে যেতে হবে।

—ঠিক আছে। তুমি বস। আগে এই টিকিটের কোন সুরাহা হয় কিনা দেখা যাক। নাইডু ওর সুটকেশটা গৌতমের কাছে রেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এলেন তিনি।

গৌতমের হাতে এক তাড়া নোট দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ভাগ্য ভালো তোমার। কাউন্টারে যেতেই রোমের একজন

যাত্রী পাওয়া গেল। গুণে নাও পুরো দেড়শ ফ্রাঙ্ক আছে। টিকিট ফেরত দিতে গেলে এত পাওয়া যেত না, বুঝলে।

—অশেষ ধন্যবাদ। গৌতম টাকাগুলো পকেটে পুরে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে নাইডুর দিকে তাকাল—আপনি ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হল।

সুটকেসটা তুলে নাইডু এবার বললেন, ও হ্যাঁ ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেন এখান থেকে ছাড়ে না। ওটা গার-দ-লেস্ত স্টেশন থেকে যাবে। পরের ট্রেন রাত দশটা কুড়িতে আছে, গুডবাই।

—গুডবাই।

নাইডু ওর প্লাটফর্মের দিকে চলে গেলেন। চিন্তিত গৌতম ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে আর একবার এনকোয়ারীতে এল। ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন। ওকে এখন গার-দ-লেস্ত স্টেশনেই যেতে হবে। ও তাই মেট্রোর সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

রাফায়ো কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমের দুটো টিকিট কেটে প্লাটফর্মে এসে ঢুকল। নিশাত ওকে দেখে এগিয়ে এল কাছে।

—ছোঁড়াটার দেখা পেলে? রাফায়ো জিজ্ঞেস করল।

—না এখনো এসে পৌঁছয়নি?

—এখনো আসেনি? রাফায়ো ঘড়ির দিকে তাকাল, সাতটা পঁয়ত্রিশ।

—আমি প্লাটফর্মটা দেখে এসেছি। ওকে পেলাম না। তুমি আর একটা চক্কর দিয়ে আসবে?

—আসছি। তুমি এদিকে খেয়াল রেখ।

কিন্তু গৌতমের পাত্তা ওরা আর পেল না। এর মধ্যে ট্রেনটাও প্রবেশ করল লাইনে। প্লাটফর্মের যা ভিড় ছিল আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল তার ভেতর। ওরা এবার অধৈর্য হয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে ট্রেন ছাড়ার সময় ঘনিয়ে এল যখন, রাফায়ো নিশাতের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, ছোঁড়াটা গেল কোথায়?

—বুঝতে পারছি না। নিশাতেরও উৎকণ্ঠিত স্বর। সামনে সন্ধানী দৃষ্টি রেখেই সে বলল, সাতটা পঞ্চাশে ট্রেন, ন নম্বর প্লাটফর্ম সবই সে জেনে গেল তখন। কোন ভুল করা তো উচিত নয়, তাহলে আসছে না কেন।

—এদিকে ট্রেন যে ছেড়ে দেবে। না আর ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তুমি এক কাজ কর। রাফায়েো পকেট থেকে টিকিট দুটো বের করে একটা নিশাতের হাতে দিয়ে বলল, আমি ট্রেনেই উঠছি। বলা যায় না ব্যাটা আমাদের ফাঁকি দিয়ে এর মধ্যে উঠেও পড়তে পারে। তুমি এখানে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। ওকে না পেলে ইয়ুথ হোস্টেলে একবার খোঁজ নিয়ে তারপর ওডিয়নে চলে যেয়ো। কাল আমি রোম থেকে তোমাকে ফোন করব।

বলতে বলতে রাফায়েো চলেই যাচ্ছিল। নিশাত ওর দেওয়া টিকিটটার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে থামাল ওকে।

—দাঁড়াও দাঁড়াও! টিকিটের পেছনে ওরই হাতে প্লাটফর্ম নাম্বার 'নাইন' লেখা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এই টিকিটটা তুমি পেলে কোথায়?

—কেন কাউন্টারেই। রাফায়েো জবাব দিল, অবশ্য এর মধ্যে একটা বাইরের একজন লোকের কাছ থেকে কিনতে হয়েছে।

—লোকের কাছ থেকে! নিশাত অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল, এই টিকিটটা কার জান, ঐ ছেলেটার। আমার সামনে বিকেল পাঁচটায় ও কিনেছিল এটা। এই দেখ এর পেছনে আমি ওকে নিজের হাতে প্লাটফর্ম নম্বর লিখে দিয়েছি। তুমি কি ওর কাছ থেকে এটা কিনেছো?

—কি বলছ যা তা! একসঙ্গে কায়রো থেকে এলাম, ওকে আমি চিনি না? রাফায়েো ঝাঁঝিয়ে উঠল। পর মুহূর্তে একটু চিন্তিত হয়ে বলল, তবে হ্যাঁ যে এটা বিক্রি করেছে সে একজন এশিয়ান।

—ব্যাপারটা কি হয়েছে খুলে বলবে?

—লোকটা কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। রাফায়েো বলল, আমি রোমের দুটো টিকিট চাইতেই কাউন্টারের ভদ্রলোক একটা টিকিট

দিয়ে আর একটা ওর কাছ থেকে আমায় নিতে বললেন। ওর কাছে ওটা নাকি বাড়তি। টিকিটটা দেওয়ার সময় সেও আমায় তাই বলল। এই টিকিটে যার যাওয়ার কথা সে নাকি শেষ মুহূর্তে যাওয়া বাতিল করেছে।

—বুঝেছি। তাহলে আর এ গাড়িতে গিয়ে লাভ নেই। নিশাত কাঁধ ঝাঁকাল। —ছেলেটা গেল কোথায় দেখতে হবে। ঐ লোকটিই বা কে, ফ্রেডরিকের কেউ নয়তো?

রাফায়োর চোখ ছুটো কুঁচকে উঠল। এক মুহূর্ত ভেবে বলল, চল কাউন্টারের ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর ঠিক কি কথা হয়েছে একবার জানতে হবে।

ওরা দ্রুতপায়ে গেট থেকে বেরিয়ে গেল।

তবে রাফায়ো আর কাউন্টারের ধারে ঘেঁষল না। নিশাতই ঝুঁকে খুব কায়দা করে জিজ্ঞেস করল, মঁসিয়ে একটু আগে একজন এশিয়ান ভদ্রলোক রোমের একটা টিকিট বিক্রি করতে এসেছিলেন এখানে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কাউন্টারের ভদ্রলোক মাথা দোলালেন। —টিকিট তো বিক্রি হয়ে গেছে তার।

—সে কথা নয়, ভদ্রলোক আমার সঙ্গী। ওকে আমি তারপর থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় যে গেলেন। আর কিছু তিনি বলেছিলেন আপনাকে?

—ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি তো ওনাকে বলে দিয়েছি গার-দ-লেস্ত থেকে ওটা ছাড়ে। আপনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি তার? দেখুন নিশ্চয়ই তিনি এদিক ওদিক খুঁজছেন আপনাকে।

—ধন্যবাদ। আমি দেখছি। নিশাত দ্রুত পায়ে রাফায়োর কাছে চলে এল—তাড়াতাড়ি কর। গার-দ-লেস্ত যেতে হবে।

—কেন?

—লোকটা ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেনের খোঁজ করছিল কাউন্টারে।

—ফ্রাঙ্কফুর্ট! রোম ছেড়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট! রাফায়ো বিস্ময়ে কাঁধ

ঝাঁকাল। কিন্তু দেরী করল না। স্টেশনের বাইরে এসে চটপট একটা ট্যাক্সি ডেকে নিশাতকে নিয়ে উঠে পড়ল।

গার-দ-লেস্তে নেমে ওরা দৌড়তে দৌড়তে স্টেশনের ভেতরে ঢুকল। নিশাত দ্রুত এনকোয়ারীর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেন এখন কটায়?

—দশটা কুড়িতে।

অর্থাৎ আরো দু ঘণ্টা পর। দুজন সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

—ওই তো! রাফায়ো নিশাতের কোমরে টোকা মেরে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

নিশাত দেখল, গৌতম ওয়েটিং রুমের ভেতর সোফায় বসে আছে। রাফায়োর দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল সে—ঐ এশিয়ান লোকটা কোথায়?

—ওকে এখানে দেখছি না। রাফায়ো আরো ভাল করে চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

নিশাত রাফায়োর পিঠে হাত রাখল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল—এদিকে শোন।

ওরা ক্যাফেটেরিয়ার পেছন ধারে এসে দাঁড়াল।

—আমার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে। নিশাতের চিন্তিত স্বর।

—অন্য রকম মানে? ছোঁড়াটা চালাকি করছে আমাদের সঙ্গে এই তো? রাফায়োর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল।

—না। চালাকি করার ছেলে ও নয়।

নিশাত হাতে হাত ঘষল। একটু চিন্তা করে বলল—ওর সঙ্গে দুদিন ঘুরে সেটা আমি ভালো করেই বুঝে গেছি। বরং উল্টোটাই বড্ড সাদা-সিধে। আমার কি মনে হয় জান, চিঠিটা ওর কাছে এখন আদৌ নেই।

—কি বলতে চাও তুমি সাফ সাফ খুলে বলতো।

—ঠিকই বলছি। আজকের তিনটে ঘটনা পর পর সাজালে ওর হঠাৎ ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। প্রথম ঘটনা, আজ সকালেই ও একটি ছেলের সঙ্গে ওর পোর্টফোলিও ব্যাগটা বদল করেছে। সে ছেলেটি এখন ফ্রাঙ্কফুর্টে। দ্বিতীয় ঘটনা ওর রুকস্যাক, পোর্টফোলিও ব্যাগ দুটোই আমার ভালো করে দেখা হয়ে গেছে কিন্তু চিঠিটা কোনটাতেই পাওয়া যায় নি। আর শেষ ঘটনা হলো ওর এই হঠাৎ রোম যাওয়া বাতিল করে ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার ব্যাপারটা। ফ্রাঙ্কফুর্ট এমন কিছু বেড়ানোর জায়গা নয়। তাছাড়া ও আমার সামনে ভনিতা করে রোমের টিকিট কেটে পরে ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে তেমন ধড়িবাজ ছেলেও সে নয়। ঐ এশিয়ানটা হয়তো ওর পথের বন্ধু মাত্র। আমি নির্ঘাত বলতে পারি চিঠিটা ওর আগের ব্যাগের মধ্যেই রয়ে গেছে। ও হয়তো নিতেই ভুলে গেছে ওটা। এখন টের পেয়ে তাই ফ্রাঙ্কফুর্ট ছুটছে।

রাফায়ো মন দিয়ে শুনল ওর কথা। গৌতম সম্বন্ধে ওকে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করার পর ওর মনেও একই ধারণার উদয় হল।

—ঐ ছোঁড়াটার নাম জান তুমি ? রাফায়ো জিজ্ঞেস করল।

—নামটা ঠিক জানিনা তবে ও অষ্ট্রেলিয়ান।

—ফ্রাঙ্কফুর্টে উঠবে কোথায় ও ?

—কেন, ইয়ুথ হোস্টেলের মেম্বার যখন, ওখানেই উঠবে।

—ঠিক আছে। থুতনিতে হাত বুলিয়ে রাফায়ো এবার তৎপর হয়ে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এক কাজ কর। ফ্রাঙ্কফুর্ট প্লেনে চলে যাও। পারলে ঐ অষ্ট্রেলিয়ানটার সঙ্গে আজ রাতেই যোগাযোগ কর। তা নাহলে অন্তত কাল ভোরে। মোট কথা এই ট্রেনটা ওখানে পৌঁছনোর আগেই ওকে তোমায় ধরতে হবে। চিঠিটা ওর কাছে থাকলে কায়দা করে আদায় করে নিও। আমি এই ছোঁড়াটার সঙ্গেই আছি। তারপর ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়ে কথা হবে।

—কোথায় দেখা হবে আমাদের ?

—হোটেল এলসটেরফে। কাজটা না হলে তুমি ওখানে উঠো।

আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। আর যদি চিঠিটা পেয়ে যাও তাহলে কাল সকালে স্টেশনেই চলে এস। ট্রেনটা কটায় ওখানে পৌঁছবে, মনে হয়?

—সাড়ে সাতটা নাগাদ। আমি তার আগেই বোধহয় কাজটা সেরে ফেলব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

—অবশ্য, তোমার আন্দাজ যদি সঠিক হয় তবেই তো? রাফায়েল সিগারে একটা জোর টান দিয়ে ওর দিকে আড়চোখে তাকাল।

নিশাত একটা লম্বা শ্বাস নিল—দেখা যাক। তারপর ধীর পদক্ষেপে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

রাফায়েল এগোল ওয়েটিং রুমের দিকে।

ইয়োরোপের দূর পাল্লার ট্রেনগুলো দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আরামপ্রদ। বিশাল কাঁচের জানলা দিয়ে ঘেরা প্রতিটি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় রয়েছে একধারে সারি সারি ক্যুপ, আরেক ধারে করিডোর। করিডোরটা দাঁড়িয়ে যাবার জন্য। তবে সেখানেও দেয়ালের সঙ্গে লাগানো কয়েকটা ফোল্ডিং সিট আছে। দরজা দেওয়া ক্যুপের সিটগুলোতে পুরু গদি। ওপরে প্রশস্ত মালপত্র রাখার জায়গা। আর দুপাশে পোশাক টাঙ্গানোর হ্যাঙ্গার। এমনকি যাত্রীদের খাওয়া দাওয়ার জন্য জানলার নিচে একটা ছোট ফোল্ডিং টেবিল পর্যন্ত রয়েছে।

গৌতম যখন ট্রেনটায় উঠল প্লাটফর্মে তখন গোনাগুণতি লোক। একটা ক্যুপে ঢুকে জানলার ধারে সিট নিয়ে বসে পড়ল সে। ওর সামনে বসে দুটি বাচ্চা মেয়ে। একটির বয়স সাত কি আট আরেক জনের বোধহয় দশ। ওরা দুজন জানলার বাইরে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। ফরাসী ভাষা, বোঝার কোন উপায় নেই। তবে মেয়ে দুটি যে দু বোন আর বাইরের ভদ্রলোক ওদের বাবা এইটুকু সে বুঝতে পারল। বাবা নিশ্চয়ই গাড়ি ছাড়ার আগে ওপরে উঠে পড়বেন।

তার একটু পরেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ক্যুপে ঢুকলেন। তিনি

নিলেন গৌতমের পাশের সিট। তখন দু পাশের আরো একটি করে সিট খালি।

কিন্তু ঐ সিট দুটোতে আর কেউ এল না। তার আগেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। গৌতম অবাক হয়ে দেখল প্লাটফর্মে দাঁড়ানো সেই ভদ্রলোক কিন্তু গাড়িতে উঠলেন না। তিনি হাত নাড়তে নাড়তে মেয়ে দুটিকে বিদায় দিলেন। তার মানে ওরা একাই যাচ্ছে ট্রেনে।

গাড়িটা চলতেই বড় মেয়েটি ওপরের বাঙ্ক থেকে ওর ছোট স্যুটকেসটা নামিয়ে একটা টেপরেকর্ডার বার করল। জানলার নীচের ফোল্ডিং টেবিলটা খুলে তার ওপর ওটা রেখে টেপটা বাজিয়ে দিল।

মৃদু ফরাসী যন্ত্র সঙ্গীতের আওয়াজ। সুরটা ভালোই লাগল গৌতমের। জানলার দিকে তাকিয়ে প্যারিসের মোহময়ী আলোক সজ্জা দেখতে দেখতে সেই সুরের মধ্যে ও বিভোর হয়ে গেল।

আধঘণ্টা কাটল এভাবে। তারপর মেয়েটা টেপ বন্ধ করে যন্ত্রটা স্যুটকেসে ঢুকিয়ে একটা উলের র‍্যাপার বের করে ঘুমন্ত ছোট বোন ও নিজের গায়ে জড়িয়ে চোখ বুজল।

পাশের ভদ্রলোকটি পত্রিকা পড়ছিলেন, মিনিট দশেক পর তিনিও উঠে পত্রিকাটি রেখে গায়ে একটা মোটা কোট পরে নিলেন। বাইরে করিডোরে তখন কোন লোক নেই। ক্যুপের দরজা ভেজিয়ে ভদ্রলোক এবার গৌতমের দিকে তাকিয়ে ফরাসী ভাষায় কি যেন বললেন। গৌতম বুঝতে না পেরে ইংরেজীতেই বলল, দুঃখিত আমি শুধু ইংরেজী জানি ফ্রেঞ্চ নয়।

ওপরের বড় আলোটার দিকে হাত তুলে তখন ভদ্রলোক ইশারায় ওকে বোঝালেন, নিভিয়ে দেব বাতিটা ?

—ও হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। গৌতম মৃদু হেসে মাথা এলিয়ে সায় দিল।

—মেরসি (ধন্যবাদ)। নাইট বাল্বের সুইচ টিপে তিনি বড় বাতিটা নিভিয়ে দিলেন।

আবছা নীল আলোয় ভরে গেল ভেতরটা। গৌতমও ওর কোটের

বোতাম কটা লাগিয়ে সিটে গা এলিয়ে দিল। গাড়ি তখন তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। প্যারীস শহর পেরিয়ে দুপাশে এখন নির্জন প্রান্তর। তাই বাইরে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গৌতম ভাবল, সত্যি এও এখানে সম্ভব। একজন পিতা দূরপাল্লার ট্রেনের একটি অসংরক্ষিত কামরায় তার ফুটফুটে সাত ও দশ বছরের দুটি মেয়েকে দামী জিনিস-পত্র সহ একা একা রাত্তির বেলায় ছেড়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে গেলেন। একেই বলে সভ্য দেশ। একটা তৃপ্তির শ্বাস নিয়ে চোখ বুজল গৌতম।

আর তখনই করিডোরের কাঁচের দরজার ওপারে রাফায়োর ছায়া মুর্তি ভেসে উঠল। রাফায়ো ওর পাশের ক্যুপেই বসে ছিল। একবার উঠে গৌতমকে দেখে নিল সে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট ৩

ফ্রাঙ্কফুর্ট ইয়ুথ হোস্টেলের ভোরবেলা। ঘুমন্ত এণ্ডারসনের বিছানার কাছে এসে হোস্টেলের একজন কর্মচারী হাতে তুড়ি মেরে কয়েকটা আওয়াজ করল। সেই আওয়াজেই জেগে গেল সে।

—মিষ্টার তোমাকে একজন বাইরে খুঁজছে।

—আমাকে? এণ্ডারসন উঠে বসল বিছানায়।

—হ্যাঁ। খুব দরকার নাকি তার। মাঝরাতেও এসেছিল। এখন আধঘণ্টা হলো বসে আছে নিচে।

এণ্ডারসনের চোখে বিস্ময়ের ছাপ। এখানে আবার ওকে কার দরকার। বিছানা থেকে নেমে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমি যাচ্ছি।

কর্মচারীটি চলে গেল।

জামা কাপড় পালটে এণ্ডারসন নিচে নামল। বাইরে গেটে এসে নিশাতকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুমি! আমাকে খুঁজছ?

নিশাতের ছদ্মবেশ তখন আর নেই। মৃদু হেসে এগিয়ে এল।—চিনতে পারছো?

—নিশ্চয়ই। তুমি প্যারিসের সেই ভারতীয় ছেলেটির বন্ধু। তোমাকে আমি ওর সঙ্গে দেখেছি ওখানে। কি ব্যাপার ?

—ঐ ছেলেটিই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

—কেন ?

—তুমি নাকি কাল সকালে ওর সঙ্গে একটা ব্যাগ পাল্টাপাল্টি করেছ। ঐ ব্যাগে ওর একটা জরুরী চিঠি রয়েঁ গেছে।

—চিঠি ? এণ্ডারসন একটু অবাক হয়ে বলল, কোথায় আমি কিছু পাইনি তো।

নিশাতের চোখে চিন্তার ছায়া নেমে এল। তবু বিনীত স্বরে বলল, ব্যাগটা তুমি একটু ভাল করে দেখবে। ও আমায় যখন পাঠিয়েছে মনে হচ্ছে চিঠিটা ওর মধ্যেই ও ভুলে রেখে দিয়েছে। ওটা ওর খুব দরকার।

—নিশ্চয়ই দেখবো। কিন্তু ও ব্যাগটা সম্পূর্ণ খালি করেই আমায় দিয়েছিল। আচ্ছা দাঁড়াও, ওটা আমি নিয়ে আসছি। এণ্ডারসন ভেতরে চলে গেল।

নিশাত স্থির হয়ে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল ছেলেটা। ওর মুখে তখন সলজ্জ হাসি ও একহাতে একটা খাম, আরেক হাতে ব্যাগ।

খামটা দেখেই নিশাতের চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

—দুঃখিত। এণ্ডারসন ওর কাছে এসে বলল, চিঠিটা পেয়েছি। ওটা সত্যি এর মধ্যেই ছিল। কিন্তু কোথায় ছিল দেখবে ? বলে সে ব্যাগ খুলে ভেতরের একটা পকেট ওকে দেখাল। পকেটটা এমন ভাবে তৈরী যে ওপর থেকে তার অস্তিত্ব মোটেই বোঝা যায় না।

খামটা ওর হাত থেকে খপ করে নিয়ে নিশাত একগাল হাসল—বুঝেছি, ঐ জন্যেই ওর ভুলটা হয়েছে। এত সযত্নে রেখেছিল যে পরে খেয়াল করতে পারে নি।

—ও এখন কোথায় ? এণ্ডারসন জিজ্ঞেস করল, ওর রোম যাওয়ার কথা ছিল না ?

—হ্যাঁ। রোমেই গেছে। নিশাত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মিথ্যেটা বলল,

আমার সঙ্গে ওর ওখানে দেখা হবে। কিছু মনে করো না। আমি এক্ষুনি রওনা হব বলেই তোমাকে অসময়ে বিরক্ত করলাম। তুমি কি ফ্রাঙ্কফুর্টেই এখন থাকছ নাকি ?

—না আজ মিউনিখ চলে যাব। এণ্ডারসন উত্তর দিল।

—কখন যাবে ?

—দুপুর নাগাদ।

—আচ্ছা গুডবাই।

—গুডবাই।

নিশাত বিদায় নিল। হনহন করে বাইরে এসে খামটার দিকে তাকাল এবার। তাকাতেই সারা শরীর ওর উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। খামটার ওপর লেখা—মিষ্টার ডন ফ্রেডরিক, ভিয়ালে আগুতো রিঘি ৭৯, রোমা।

ইয়োরোপীয়ানদের সময় নিষ্ঠা দেখে সত্যি মুগ্ধ হতে হয়। ট্রেনটা ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছনোর কথা সকাল সাতটা সাতচল্লিশে। পৌঁছলও তাই। ফ্রাঙ্কফুর্টে গাড়িটা যখন গিয়ে দাঁড়াল, গৌতম জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল স্টেশনের ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা সাতচল্লিশ।

রুকস্যাকটা হাতে নিয়ে এবার সে গাড়ি থেকে নামল। ওর প্রায় পেছন পেছন ছিল রাফায়েল।

গৌতম প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে ট্যুরিস্ট কাউন্টারের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল। ট্যুরিস্ট কাউন্টার ইয়োরোপের প্রতিটি বড় বড় রেল স্টেশনেই থাকে। ইয়ুথ হোস্টেলটা এখানে কোথায় ও সেখানে যাবার উপায় কি তা জানতে হলে এখন ওদেরই সাহায্য নিতে হবে।

ফ্রান্স ছেড়ে এখন একেবারে জার্মানিতে চলে এসেছে গৌতম। এজন্য পথে ট্রেনের ভেতরই ওর পাসপোর্ট হেলথ চেকিং পর্যন্ত হয়ে গেছে। ইয়োরোপ এমনই এক আজব জায়গা। এখানে এক রাত্রেই রেলে করে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে আসা যায়। এ দেশের ভাষা আবার অন্য রকম। ইংরেজী এখানেও কেউ বোঝে না। তবে

সরকারের এদিকে পুরোপুরি খেয়াল আছে। ট্যুরিস্টদের যাতে কোন অসুবিধে না হয় তাই এখানেও ট্যুরিস্ট কাউন্টারে রয়েছে ভাল ইংরেজী জানা লোক। গৌতম আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁদিকে সেই লোকদের সন্ধান পেল।

রাফায়ো খুব সাবধানে যাত্রীদের ভীড়ের মধ্যে মিশে ওকে অনুসরণ করছিল। এমন সময় নিশাত পেছন থেঁকে এসে ওর পিঠে টোকা মারল।—চিঠিটা পাওয়া গেছে।

মৃদু স্বরে ওর এইটুকু সংবাদ শুনেই রাফায়ো মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।—পড়েছো? ওর উত্তেজিত গলা।

—হ্যাঁ। এদিকে এস।

ওরা ট্যুরিস্ট কাউন্টারের সামনে দাঁড়ান গৌতমের ওপর লক্ষ্য রেখেই একটা থামের আড়ালে চলে এল। নিশাত সেখানেই সযত্নে সীল খোলা খামটা রাফায়োর হাতে দিল।

রাফায়ো পড়ল চিঠিটা। অ্যারাবিয়ান ভাষায় লেখাগুলো পড়তে পড়তে ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

—সব ঠিক। যা আমি বলেছিলাম হুবহু তাই। চিঠিটা শেষ করে নিশাতের দিকে তাকাল সে।—তাহলে ছোঁড়াটাকে আমাদের যে কত দরকার সেটা বুঝতে পেরেছ?

—হ্যাঁ। ওকে কিছুতেই ছাড়া চলবে না। একটা দ্রুত নিশ্বাসের আওয়াজ করল নিশাত। দূরে গৌতমের দিকে আবার তাকিয়ে বলল, এজন্য আমি একটা মতলব এঁটেছি।

—কি মতলব?

—ছেলেটাকে নির্বিঘ্নে রোম নিয়ে যাওয়ার এক মাত্র উপায় হচ্ছে এই চিঠিটা আবার ওকে ফেরত দিয়ে দেওয়া। চিঠির মাল মশলা আমাদের জানা হয়ে গেছে। সেদিকে কোন চিন্তা নেই। কিন্তু এটা ফেরত পেলে ও যথারীতি ফ্রেডরিককে ওটা দিতে রোমেই যাবে। তখন আমরা ওকে কাবু করে ফেলব।

রাফায়ো ঘাম মুছল কপালের। ভাবতে ভাবতে একটা নতুন

সিগার ধরাল। এর মধ্যে নিশাত দেখল গৌতম ট্যুরিস্ট কাউন্টার ছেড়ে মানি এক্সচেঞ্জের জানলার দিকে পা বাড়িয়েছে। ওর ঠেলা খেয়ে রাফায়োরও দৃষ্টি ছুটল।

ওরা আবার চলতে শুরু করল। গৌতম মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টারে যখন ওর ফরাসী মুদ্রাগুলোকে জার্মান ডুয়েস মার্কে পালটাতে ব্যস্ত তখন রাফায়ো দাঁড়িয়ে নিশাতকে জিজ্ঞেস করল, ওই অষ্ট্রেলিয়ানটা কোথায়?

—কেন, ইয়ুথ হোস্টেলেই আছে।

—ওর সঙ্গে ছোঁড়াটার দেখা হলে সব গোলমেলে হয়ে যাবে না?

—তা তো হবেই। আমি যে এভাবে এখানে ছুটে এসে চিঠিটা ওর কাছ থেকে নিয়েছি সেটা জানতে পারলে ও নিশ্চয়ই ভড়কে যাবে। তবে হ্যাঁ এটা এখন ওকে ফেরত দিলে ও আর হোস্টেলের দিকে হয়তো যাবে না।

—তাহলে তাই কর।

—তারপর?

—তারপর তুমি প্লেনে করে চলে যাও রোমে। ফ্রেডরিকের যখন ঠিকানা পাওয়া গেছে মার্তিনোর সাহায্য নিয়ে ওর একটা ব্যবস্থা কর গিয়ে। আমি এই ছোঁড়াটার পেছন পেছন সেখানে আসছি। মোট কথা একে আমায় চোখে চোখে রেখেই ওখানে নিয়ে যেতে হবে। তারপর রোমে গিয়ে বাকি কাজটুকু আমরা সেরে ফেলবো।

—ঠিক আছে তবে একটা কথা, ছেলেটার কিন্তু হিচ হাইকিং করে ইয়োরোপ ঘোরার ইচ্ছে। ও যে কোন মুহূর্তে গাড়ির লিফট নিতে পারে! যদিও এখান থেকে মনে হয় ট্রেনেই রোম যাবে। তাহলেও খেয়াল রেখ।

—হিচহাইকারদের গাড়ির লিফট নেওয়ার সময় হচ্ছে সকাল। রাফায়ো সিগারে একটা টান দিয়ে বলল, ও যদি আজ এখানে থেকে যায় তাহলে কাল সকালে আমি না হয় একটা গাড়ি ভাড়া করে নেব। ও নিয়ে তুমি ভেব না।

—বেশ। আমি তাহলে চলি। নিশাত পা বাড়াল। কিন্তু

তুমিও সাবধানে থেকো। ভুলে যেয়ো না জার্মান, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ প্রতিটি পুলিস তোমায় খুঁজছে।

রাফায়ো থুতনিতে হাত বুলিয়ে একটু গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমার জন্য চিন্তা করো না। তুমি তোমার কাজ কর গিয়ে।

গৌতম স্টেশনের বাইরে এসে ট্যুরিস্ট কাউণ্টারের নির্দেশ অনুযায়ী ইয়ুথ হোস্টেল যাওয়ার ট্রাম ধরতে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় নিশাতকে হঠাৎ সামনে দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল।—আশ্চর্য্য! তুমি এখানে?

—বাঃ বাঃ দোস্ত, আমারও তো একই প্রশ্ন। নিশাত অবাক হওয়ার ভান করে বলল, তুমি রোমের বদলে এখানে এলে কি করে?

গৌতম ঠোঁটে একটা শুকনো হাসি আনল। ভ্রূ তুলে বলল, ভুলের মাশুল দিতে এসেছি। ঐ অষ্ট্রেলিয়ান ছেলেটার কথা মনে আছে তোমার, যার সঙ্গে কাল ব্যাগ বদল করলাম?

—আলবাত মনে আছে। তাছাড়া ওর সঙ্গে তো আমার এইমাত্র দেখা হল।

—দেখা হলো! কোথায়? উৎকণ্ঠিত গৌতম চম্‌কে তাকালো ওর দিকে।

—চলে গেছে। নিশাত বেশ সহজ সুরেই বলল, ও স্টেশনে কোলনের ট্রেন ধরতে এসেছিল। দেখা হতেই আমার হাতে তোমার এই চিঠিটা দিল, বলেই পকেট থেকে খামটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিল নিশাত।—এটা নাকি তোমার ওই ব্যাগের মধ্যে পেয়েছে ও।

—অদ্ভুত! খামটা হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে তাকালো গৌতম। গদগদ কণ্ঠে বলল, আমি তো এর জন্যই ছুটে এসেছি এখানে।

—তাই নাকি। এত দরকারী চিঠি এটা? নিশাত চোখ বিস্ফারিত করল। অথচ আমি এটা নিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। কারণ তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে কি হবে না তার

কি কোন ঠিক ছিল। পরে ভেবে দেখলাম এখানকার কাজ সেরে রোম চলেও যেতে পারি তাই নিলাম। এখন দেখছি নিয়ে ভালই করেছি, কি বলো ?

—নিশ্চয়ই। তা আর বলতে ? খুশির ঘোরেই বলে উঠল গৌতম। প্যারিসে তোমায় আমি বলেছিলাম না যে একটা চিঠির জন্য রোম আমায় সবার আগে যেতে হবে। এটাই সেই চিঠি।

—বলো কি হে, তুমি আচ্ছা ছেলে তো! সেই চিঠিটাই হাতছাড়া করে বসেছিলে ?

—আর বলো না। এজন্য যা দুর্ভোগ হ'ল। রোম ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট। এখন তাই ভীষণ রাগ হচ্ছে নিজের ওপর।

এবার হো হো করে হেসে উঠল নিশাত। হাসতে হাসতেই বলল, রাগ হবারই কথা। তবে চিঠিটা যখন পেয়ে গেলে আর চিন্তা কি ? এখন সোজা রোম চলে যাও। এখান থেকে দুপুর বারোটার সময় তুমি সোজা রোম যাওয়ার ট্রেন পাবে।

—তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তাই যাবো, গৌতম মাথা দোলাল। কিন্তু হ্যাঁ, তোমার এখানে আসার কারণ কি বললে না তো ?

—কারণ আবার কি। চাকরির সন্ধান ? নিশাত কাঁধ ঝাঁকাল। কাল যে বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম সেই এখানে একজনের কাছে পাঠিয়েছে আমাকে। কাজটা অবশ্য ইটালীর। হলে পর আবার আমায় রোমেই যেতে হবে। আচ্ছা চলি দোস্ত। বিদায় !

—তুমি সফল হও কামনা করি ! গৌতম হাত বাড়াল।

নিশাত হাতে হাত মিলিয়ে জোর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটে গেল ট্রাম ধরতে।

নিশাতের ট্রামটা চলে যেতেই থামটার দিকে আবার তাকালো গৌতম। সত্যি, কি অদ্ভুত ঘটনা। ভাবতেও মজা লাগে। কোথায় ও প্যারিস থেকে এখানে ছুটে এসেছে এণ্ডারসনের খোঁজে, সেই এণ্ডারসনের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ওর দেখা না হয়ে হল নিশাতের। ভাগ্যিস নিশাত এসেছিল এখানে। তারপর নিশাতের সঙ্গে ওর

সাক্ষাতটাও কি অপ্রত্যাশিত। অথচ এই সাক্ষাতটুকু না হলে কি বিপদেই না পড়ত ও। আবার কোথায় যে চিঠিটা চলে যেত তার কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না। একেই বলে যোগাযোগ।

গৌতম খামটা পোর্টফোলিও ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। যাক, চিঠিটা যখন পাওয়া গেল এখন নির্বিঘ্নে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটা ঘুরে নেওয়া যেতে পারে। এতদূর এসে জায়গাটা না দেখে তো আর ফেরা যায় না।

তবে হ্যাঁ, ঘুরতে যাওয়ার আগে ট্রেনের সময়গুলো একবার জেনে যেতে হবে। গৌতম স্টেশনের দিকে পা বাড়াল।

হাঁটতে হাঁটতে তখনই একটা প্রশ্ন হঠাৎ টোকা মারল ওর মাথায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে এবার কোথায় যাবে ও? নিশাতের কথা মতো সোজা রোম না অন্য কোথাও। ব্যাপারটা ভাবনার বিষয়। কারণ প্যারিস থেকে রোমের একেবারে উল্টোদিকে চলে এসেছে গৌতম। এখান থেকে রোম ও যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তা বলে মাঝখানের বিরাট এলাকাটা না ঘুরেই? না তা হয় না। ওর ভাবতে একটু অস্বস্তি লাগলেও মনে মনে ঠিক করে নিল, রোম যাওয়ার পথে আশেপাশের প্রধান প্রধান জায়গাগুলো সে দেখেই নেবে। এজন্য রোমে পৌঁছতে ওর হয়তো একটু দেরী হবে। কিন্তু ও নিরুপায়। কি করবে, চিঠিটা যতই দরকারী হোক ওর দুর্লভ ইয়োরোপ ভ্রমণ তো আর মাটি করতে পারে না।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে স্টেশনে এসে পৌঁছল সে। তারপর ব্যাপারটা আরো খুঁটিয়ে দেখার জন্য ওয়েটিং রুমে গিয়ে ইয়োরোপের ম্যাপটা নিয়ে বসল।

ম্যাপটা দেখে মোটামুটি একটা ছক এঁকে নিল। এখান থেকে ও প্রথমে যাবে মিউনিখ, তারপর ভিয়েনা, সবশেষে ভেনিস্ হয়ে রোম। এরপরের পরিকল্পনা ও রোমে গিয়েই করবে।

ছকটা এঁকে ও ঠিক করল, রোমের ভদ্রলোককে একটা টেলিগ্রাম অন্তত করে দেওয়া উচিত। তাতে ভদ্রলোককে জানিয়ে দেবে যে

মহম্মদ জামিলের চিঠিটা নিয়ে ও কয়েকদিনের মধ্যেই রোমে আসছে। ব্যস, তাহলেই মনে হয় উনি একটু নিশ্চিন্ত হবেন।

গৌতম উঠে দাঁড়াল।

ও সোফা থেকে উঠতেই রাফায়ো ওয়েটিং রুমের বাইরে একটা থামের আড়ালে সরে এল।

তারপর এনকোয়ারী। গুটি গুটি গৌতমকে অনুসরণ করে সে দিকেই পা বাড়ালো সে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটা আকারে তেমন বড় নয়। এর কয়েকটা অংশ পায়ে হেঁটেই ঘুরে বেড়ালো গৌতম। ঘুরতে ঘুরতে একটা পোষ্ট অফিসে ঢুকে রোমের ডন ফ্রেডরিককে টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিল। তারপর মেন নদীর ধারে বসে প্যারিসের মতোই লাঞ্চ সেরে, গেল বিখ্যাত হেনীঙ্গার টাওয়ার দেখতে। তিনশ আশি ফুট উঁচু এই টাওয়ারের ওপরে রয়েছে ঘূর্ণায়মান একটা বড় রেষ্টুরেন্ট।

সেটা দেখেই গৌতম স্টেশনে ফিরে এল। তখন দুপুর তিনটে। ওর মিউনিখের ট্রেন আর প্রায় আধ ঘণ্টা পর তিনটে কুড়িতে ছাড়বে। টিকিটটা কেটে লকার থেকে রুকস্যাকটা বের করে ওয়েটিং রুমে এসে বসলো।

—ক্ষমা করবেন, ঐ ছেলেটা কোথাকার টিকিট কাটলো, বলতে পারেন? গৌতম টিকিটটা কেটে যাওয়ার পরেই রাফায়ো কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—মুনচেন। ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

—আমাকেও তাই দিন একটা। রাফায়ো একশ মার্কের একটা নোট এগিয়ে দিল।

—কেন, ওর সঙ্গে তোমার কি? ভদ্রলোক টিকিটটা দিতে দিতেই একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—বাঃ ও আমার সঙ্গী। রাফায়ো মুচকি হাসল, রাগ করে চলে যাচ্ছে বলে একা একা ছেড়ে দেবো নাকি?

—তাই বলো। টিকিট ও পয়সা ফেরত দিয়ে তিনিও মৃদু হাসলেন।

রাফায়ো আবার ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

রোমা ৪

গৌতম যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে মিউনিখের ট্রেনে চড়ল তখন রোমের শহরতলীর একটা ঘরে সেই ডন ফ্রেডরিক অত্যন্ত বিচলিত পদক্ষেপে পায়চারি করছিল। ডন ফ্রেডরিক ছিপছিপে চেহারার সাঁয়ত্রিশ আটত্রিশ বছর বয়সের মানুষ। ঘরের দুদিকে পায়চারি করতে করতে সে তখন বড্ড অস্থির। এমন সময় বাইরের দরজায় টোকা পড়ল।

ফ্রেডরিক দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলো একটি যুবক। লম্বা স্বাস্থ্যবান চোখদুটো কটা।

—তুমি আমায় ডেকেছ ডন?

—হ্যাঁ। দরজাটা বন্ধ করে এদিকে এস! ফ্রেডরিক ওকে ইঙ্গিত করে কোণের টেবিলটার কাছে গিয়ে বসল। ওর প্রায় পেছন পেছন এসে যুবকটিও বসল সেখানে।

—কি ব্যাপার? কিছু গোলমাল হয়েছে? ফ্রেডরিকের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠল তার।

—গোলমালের চেয়েও বেশী কিছু হয়েছে, মার্কো! ফ্রেডরিকের স্বর কেঁপে উঠল, কায়রো থেকে ম্যাককান জানিয়েছে রাফায়ো আর নিশাতকে ওখানে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

—সেকি! মার্কোও চমকে উঠল, জামিল দুদিন আগে জানালো না, একটা ভারতীয় ছেলেকে সে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে?

—হ্যাঁ। তারপরেই এই সংবাদ। তার মানে বুঝতে পারছো, রাফায়ো আর নিশাত এখন কোথায়?

—এতে আর বোঝার কি আছে। মার্কোর চোখে আতঙ্কের ছায়া নেমে এলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে অস্থির কণ্ঠে বলল, ওরা নিশ্চয়ই ঐ ছেলেটিকে ফলো করছে। কিন্তু জামিল এ ভুল করল কি করে? তার মানে ছেলেটার সঙ্গে ওর যোগাযোগের কথা ওরা জানতে পেরে গেছে।

—উত্তেজিত হয়োনা মার্কো। বস। ফ্রেডরিক একটা লম্বা দম নিলো। মার্কোকে চেয়ারে আবার বসিয়ে ধীরে ধীরে বলল, অবশ্য উত্তেজিত হবারই কথা। সংবাদটা পেয়ে আমিও কম অস্থির হয়েছি ? তবে যা ঘটার ঘটে গেছে। এখন সে নিয়ে দুঃখ করে আর লাভ নেই। জামিল আসলে ভালর জন্যেই কাজটা করেছিল। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই খুব সতর্কও ছিল সে। ওর একমাত্র ভুল রাফায়ো যে ওর চেয়েও কত ধূর্ত সে ধারণাটাকে ভুলে যাওয়া। তারই মারাত্মক পরিণতি হল এই।

—যাইহোক এখন আমাদের প্রথম কাজ ওরা এসে পৌঁছনোর আগেই এখান থেকে সরে পড়া।

—ওরা কিন্তু যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।

—হ্যাঁ। তাই কাজটা দ্রুত করতে হবে।

—কোথায় যাবো আমরা ?

—এই এলাকাটা ছেড়ে টাইবেরের ওপারে।

—তারপর ? মার্কোর চিন্তিত স্বর।—ঐ ভারতীয় ছেলেটাকে তো ছাড়া চলবে না।

—হ্যাঁ। সেজন্যই একটা পরিকল্পনা করেছি আমি। ফ্রেডরিক ঝুঁকে বসলো মার্কোর দিকে। একটু কেশে বলল, তুমি এক্ষুনি নতুন জায়গায় চলে যাবার পর আমি শুধু এখানে থাকবো।

—তুমি !

—হ্যাঁ। এখানে বলতে অবশ্য এই ঘরে নয়। আমি থাকবো ওই আট তলার একটা ঘরে। ফ্রেডরিক জানলা দিয়ে বাড়িটা দেখালো মার্কোকে।—ওখান থেকে এই আস্তানার ওপর আমি লক্ষ্য রাখবো। যাতে ছেলেটা এলেই আমার নজরে পড়ে।

—কিন্তু ডন, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে ছেলেটার পেছনে রাফায়ো ও নিশাত থাকবে।

—থাকুক না, ওরা তো আসবে আমাদের খোঁজে। কিন্তু যখন এসে দেখবে আমরা এখানে নেই তখন ? তখন নিশ্চয়ই পাগলের মতো আমাদের খোঁজে ছুটবে এদিক ওদিক। সেই ফাঁকে ছেলেটির সঙ্গে

আমি যোগাযোগ করে নেব। তারপর ওকে নিয়ে চলে যাব আমাদের নতুন ডেরায়।

সব শুনে গম্ভীর হল মার্কো। একটু ভেবে বলল, না ডন তা হয় না। রাফায়েো যেমন ধূর্ত ওর লোকবলও তেমনি প্রচুর। তোমাকে একা এখানে আমি থাকতে দেব না। তাহলে আমাকেও থাকতে হয়। তাই হোক না! নতুন ডেরাতে না হয় শুধু রিচার্ড চলে যাবে। রিচার্ড নিশ্চয়ই—

ওদের কথায় বাধা পড়ল। হঠাৎ টক টক করে দরজায় শব্দ হল দুটো।

ফ্রেডরিক উঠে দরজা খুলেই বলল, কি হল রিচার্ড?

—তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে ডন।

—টেলিগ্রাম! রিচার্ডের বাড়ানো খামটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল ফ্রেডরিক। তারপর ওটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে বলল, ঠিক আছে তুমি যাও।

দরজা বন্ধ করে খামটা খুলতেই ভেতরের কাগজ খানা বেরিয়ে এল। তার ওপর লম্বা একটা সংবাদ ঃ

"কায়রোর মহম্মদ জামিলের চিঠি নিয়ে মিউনিখ, ভিয়েনা ও ভেনিস হয়ে তোমার কাছে আসছি।"—গৌতম, ফ্রাঙ্কফুর্ট।

সংবাদটা পর পর দুবার পরে হতবাক হয়ে গেল ফ্রেডরিক।

—কার টেলিগ্রাম ডন? মার্কো এগিয়ে এলো। তারপর ফ্রেডরিকের কাছে এসে কাগজখানা পড়ে বিড়বিড় করে বলল, গাউতাম! আচ্ছা, সেই ভারতীয় ছেলেটি? কিন্তু ওর প্যারিস থেকে সোজা এখানে আসার কথা ছিল না? হঠাৎ ফ্রাঙ্কফুর্ট গেল কেন?

—শুধু ফ্রাঙ্কফুর্ট নয়। ও আবার লিখেছে মিউনিখ ভিয়েনা, ভেনিস হয়ে এখানে আসবে। অর্থাৎ আরও অন্তত পাঁচ ছ, দিনের ব্যাপার। বলতে বলতে ফ্রেডরিকের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। মাথা নেড়ে বলল, না না তা হয় না। এতদিন দেরী করা অসম্ভব। একটা কিছু করতে হবে।

—জামিলের আগের চিঠিটা কোথায়? ওটা একটু বার করবে? মার্কো তৎপর হয়ে উঠল।

ফ্রেডরিক টেবিলের দিকে এগিয়ে চাবি মারা দেরাজটা খুলে চিঠিটা বার করল।

দুজনেই আবার মন দিয়ে পড়ল ওটা।

ফ্রেডরিক,

রাফায়োর চরদের চোখ এড়িয়ে এখান থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত একজন ভারতীয় কিশোরকে তোমার কাছে পাঠালাম। কাজটা একে দিয়ে করাতে পারবে নিশ্চয়ই। ছেলেটা একেবারে একা। এখান থেকে প্যারিস গিয়ে ইয়ুথ হোস্টেলে উঠবে। তারপর সোজা রোম। ওর সঙ্গে অনর্থক এমন কোন ব্যবহার করো না যাতে ও কিছু সন্দেহ করে।

জামিল।

—প্যারিস গিয়ে ইয়ুথ হোস্টেলে উঠবে। চিঠিটা পড়তে পড়তে লাইনটা আবার আওড়াল ফ্রেডরিক।

—তার মানে, মিউনিখেও তাই ভিয়েনা, ভেনিসেও তাই। সব জায়গায় ওই ইয়ুথ হোস্টেল হচ্ছে ওর ঠিকানা। মার্কো নিশ্চিন্তির একটা শ্বাস নিলো, চল ডন আর দেরী করা ঠিক নয়। ঠিকানাটা যখন পাওয়া গেল আমরা মিউনিখ রওনা হয়ে পড়ি। ওকে আজ না হয় কাল ওখানে পাওয়া যাবেই। আর রিচার্ড চলে যাক নতুন জায়গায়।

ফ্রেডরিক এক দৃষ্টিতে মাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তারপর মাথা ঝাঁকালো, ঠিক আছে তাই চলো।

মুনচেন ৫

রাত আটটা পঞ্চাশে ট্রেনটা ইন্ করল মিউনিখে।

স্টেশনের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্লাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে এল গৌতম। এ সময় ইয়ুথ হোস্টেলে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ ইয়ুথ হোস্টেল হ্যাণ্ডবুকেই লেখা আছে হোস্টেলে জায়গা পেতে

হলে সন্ধে সাতটার মধ্যে রিপোর্ট করতে হয়। অতএব এখন সস্তার একটা হোটেল ছাড়া কোন গত্যান্তর নেই।

গৌতম ট্যুরিস্ট কাউন্টারের খোঁজে পা বাড়াল।

—রাতে থাকার মতো একটা সস্তার জায়গার খোঁজ দিতে পারেন?

ওর প্রশ্ন শুনে কাউন্টারের হাসিখুশি মেয়েটি মুখে আরো হাসির আলো ফুটিয়ে বলল, তোমার বাজেট কত?

—যতটা সম্ভব কম।

—ডরমিটরি সিস্টেম, কমন্ বাথ হলে চলবে?

—নিশ্চয়ই, আমি শুধু রাতটাই কাটাবো সেখানে।

—ঠিক আছে দাঁড়াও।

মেয়েটি ফোনের রিসিভার তুলল। পরপর অন্তত আট নটা ফোন করল সে। প্রত্যেকের সঙ্গে জার্মান ভাষায় কথা বলল, যেটা গৌতমের কাছে পুরোপুরি দুর্বোধ্য। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইটুকু সে বুঝতে পারলো যে কোথাও সিট খালি নেই, আবার কোথাও হয়তো দরে পোষাচ্ছে না।

শেষ ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে মেয়েটি গৌতমকে ইংরেজীতে বলল, একটা জায়গা পাওয়া গেছে। পনেরো মার্ক। কিন্তু জলখাবার বাদে। চলবে?

গৌতম মনে মনে হিসেব করে নিলো। পনেরো মার্ক মানে পাঁচ ডলার।—চলবে। এত রাত বলে বাধ্য হয়ে সম্মতি জানালো সে।

প্রয়োজনীয় আরো দু একটা কথা সেরে মেয়েটি ফোনটা ছেড়ে দিল। তারপর একটা রসিদবুক টেনে গৌতমকে বলল, দাও পনেরো মার্ক।

—টাকাটা এখানেই দিতে হবে?

—হ্যাঁ। তোমার সিট বুক হয়ে গেছে। আমাদের রসিদ নিয়ে সেখানে দেখালেই জায়গা পেয়ে যাবে।

বাঃ ভালো ব্যবস্থা তো! গৌতম পকেট থেকে পনেরো মার্ক বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল। টাকাটা নিয়ে মেয়েটি রসিদ কেটে

গৌতমকে মিউনিখের ম্যাপ খুলে ভালো করে বুঝিয়ে দিল কোথায় ওকে যেতে হবে।

রেল স্টেশনের কাছেই জায়গাটা। রাত্তির বেলা চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের আলোর মালা দেখতে দেখতে নির্জন রাস্তাটা হেঁটেই গেল গৌতম। তারপর একটা মোড়ের কাছে এসে একজনকে জিজ্ঞেস করল। তিনি হোটেলের রসিদটা দেখে বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন।

গৌতম এগিয়ে গেল। সে বাড়ির দরজায় অনেকগুলো নেমপ্লেট। তার মধ্যে 'পেনসিওন হেলভেটিয়া' নামটাও ঝুলছে। কিন্তু দরজাটা বন্ধ। ঠেলা দিয়েও খোলা গেল না। তখন ঐ নেমপ্লেটের পাশের কলিং বেলটা দুবার টিপতেই গৌতম শুনলো বাড়ির তিনতলার ব্যালকনি থেকে কে যেন ওকে হ্যালো হ্যালো করে ডাকছে। গৌতম সরে এসে তাকিয়ে দেখল এক ভদ্রমহিলা ঝুঁকে ওপরে যেতে বলছে ওকে।

কিন্তু গৌতম ঢুকবে কি করে, বাড়ির দরজা যে বন্ধ।

না না, বন্ধ নয় ঠেল তুমি। গৌতমের ইঙ্গিতের উত্তরে ভদ্রমহিলা জার্মান ইংরেজী মিশিয়ে বললেন।

গৌতম আবার ঠেললো। ওমা তাই তো! বন্ধ দরজাটা ঠেলা দিতেই এবার খুলে গেল। কিন্তু কে খুললো ওটা? ভেতরে ঢুকে কাউকে না দেখে সে অবাক হল। দরজাটা আবার আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

গৌতম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। সিঁড়ির গোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই ভদ্রমহিলা। হাসি হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে রসিদটা দেখে ওকে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেলেন। সুন্দর পর্দা ও ফার্নিচারে সাজানো দু-বিছানার কামরা একটা। তবে পুরোটাই এখন খালি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে তিনি বললেন, কাল সকালেই কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে।

—নিশ্চয়ই। গৌতম ঘাড় নাড়ল। আমি ভোরেই বেরিয়ে পড়বো।

—ব্রেকফাস্ট এখানে পাবে না, সেটা জানো তো?

—জানি।

—আর ঐ যে তোমার বাথরুম লেভেটরি। তবে ওটা কমন্।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে তাতেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা—। গৌতম প্রশ্নটা না করা অবধি যেন শান্তি পাচ্ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলল।—নিচের দরজাটা কে খুললো? ওখানে কাউকে তো দেখলাম না,।

—নিচের দরজা! ভদ্রমহিলা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। কেন, আমিই খুলেছি।

—আপনি?

তখন ভদ্রমহিলা ওর কৌতুহল নিবৃত্ত করলেন। এখানে নাকি সব ফ্ল্যাট বাড়িতে সদর দরজার তালার সঙ্গে প্রতিটি ফ্ল্যাটের বিদ্যুতে যোগাযোগ থাকে। ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠলেই তার বাসিন্দারা ব্যালকনি বা অন্য কোন জায়গা থেকে আগন্তককে একবার দেখেই তালাটা সুইচ টিপে খুলে দেন।

গৌতম ঢোক গিললো তাহলে এই ব্যাপার! ভদ্রমহিলা নিচে কষ্ট করে না নেমেই ওপর থেকে দরজা খুলে দিয়েছেন। বাঃ এ তো বড় সুন্দর ব্যবস্থা!

রাফায়ো মিউনিখ রেল স্টেশন থেকে গৌতমকে অনুসরণ করছিল। ও হাঁটছিল গৌতমের উল্টোদিকের ফুটপাতে বাড়িগুলোর দেয়াল ঘেঁষে। গৌতম 'পেনসিওন হেলভেটিয়াতে' উঠে যাবার পর প্রায় মিনিট পনেরো সে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। এখন সে এই রাস্তার শেষে একটা হোটেলের দিকে যাচ্ছে।

আজ রাতটা সেখানেই কাটাবে রাফায়ো।

পাঁচ ডলার অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকায় মাত্র ন ঘণ্টা কাটিয়ে পরের দিন ভোরেই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল গৌতম। মিউনিখে এমনিতে দেখার অনেক কিছু আছে। কিন্তু গৌতম প্রধানত দুটো জিনিস দেখতে

ছুটে এসেছে এখানে। তার একটি হল মিউনিখের উনিশশ বাহাত্তর সালের অলিমপিক গেমসের ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্স। আর দ্বিতীয়টা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যার মিউজিয়াম।

রেল স্টেশনের ট্যুরিস্টকাউন্টারে জায়গাগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনে গৌতম মিউনিখ পরিদর্শন শুরু করে দিল।

মিউনিখে যানবাহন বলতে বাস, ট্রাম আর পাতাল রেল। অবশ্য পাতাল রেলটা অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই সবে এখানে তৈরী হয়েছে। এর স্থানীয় নাম ইয়ু-বান। মিউনিখের প্রথম ইয়ু-বান স্টেশনে নেমে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল গৌতম। অত বড় স্টেশন অথচ কোথাও কোন টিকিট কাউন্টার নেই। তার বদলে প্লাটফর্মে নামার মুখে রয়েছে কতগুলো স্লট মেসিন। সেখানে পয়সা ফেললে টিকিট বেরিয়ে আসে। কিন্তু টিকিট কেটে তুমি ট্রেনে উঠছ কিনা তা দেখার জন্য গেটে টিকিট চেকারও নেই। উপরন্তু পাতাল রেল কোম্পানীর যাত্রীদের ওপর এতই অগাধ বিশ্বাস যে টিকিটটা পাঞ্চ করার ভারও তারা যাত্রীদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। পাঞ্চিং মেসিনগুলো রয়েছে প্লাটফর্মে ঢোকার গেট বা চলন্ত সিঁড়ির ঠিক মুখেই।

পাতাল ট্রেনের ভেতরেও সেই একই ব্যাবস্থা। সেখানে না রয়েছে টিকিট চেকার না গার্ড। সেখানে ট্রেনের একমাত্র ড্রাইভার, যারা বেশির ভাগই মহিলা, একাই একশ। ট্রেনটা দাঁড়ানোর পর তারা নিজেরাই ইঞ্জিনের পাশে লাগানো প্লাটফর্মের টেলিভিসনে প্রতিটি বগির দরজাগুলোকে দেখে গার্ডের কাজ করছেন।

মিউনিখে গৌতমের দুপুরের খাবার কিনতে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটাও মজার। মিউনিখের প্রধান কেনা-কাটার অঞ্চলের নাম মারিয়ান-প্লাজ। মারিয়ান-প্লাজ শহরের ব্যস্ততম কেন্দ্র। এখানে মণিহারির চোখ ধাঁধানো পসরা সাজিয়ে যেমন ছোটখাটো দোকান রয়েছে তেমনি আছে বড় বড় বিভাগীয় দোকান। বড় বলতে একটু আধটু বড় নয় একেবারে পাঁচ ছ তলা মস্ত বাড়ি। গৌতমকে ওর খাবার কিনতে এমনি একটা দোকানে ঢুকতে হয়েছিল। ঢুকে চক্ষু ওর চড়ক গাছ। দোকান তো নয় যেন

একটা বড় গোছের মেলা। কি না পাওয়া যায় সেখানে। সুন্দর প্যাকেটে মোড়া ফুলগাছের মাটি থেকে শুরু করে প্যাকেটে মোড়া আলু পেঁয়াজ মাছ পর্যন্ত। এ তো এক তলার ব্যাপার। তারপর দোতলা থেকে চারতলায় টেলিভিসন কাপড় চোপড়, খেলনা মায় জুতো পর্যন্ত। সে এক এলাহী কাণ্ড। ঘুরে সব দেখতে দিয়ে গৌতমের পা ব্যাথা হয়ে গেল। যদিও প্রতিটি তলায় নীচে ওপরে ওঠা-নামার জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি। অথচ এত বড় দোকানে শুধু মাত্র পোশাক আশাকের মত প্রয়োজনীয় জায়গা ছাড়া আর কোথাও কোন সেলস-ম্যান নেই। খদ্দের ও পাহাড় সমান সাজানো রকমারি জিনিস পত্র বাদে তলার পর তলা সব ফাঁকা। খদ্দেররা যে যার জিনিস খুঁজে নিজেরাই দোকানের দেওয়া প্যারামবুলেটারের মত গাড়িগুলো বোঝাই করে নিচ্ছে। তারপর দোকান থেকে বেরোনোর সময় সারি সারি হিসেব করার মেসিনগুলোর সামনে বসা মেয়েদের কাছে পাওনা মিটিয়ে চলে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, সেলসম্যান অনুপস্থিত বলে কেউ যে খদ্দেরদের লক্ষ্য করছে না, তা নয়। দোকানের জায়গায় জায়গায় রয়েছে টেলিভিসন ক্যামেরা। এবং তার মারফৎ দোকানের কর্মচারীরা অফিসের টেলিভিসনের দিকে তাকিয়ে সব কিছু লক্ষ্য রাখছে।

তখন বিকেল সাড়ে ছটা।

মিউনিখ ইয়ুথ হোস্টেলের সদর গেট থেকে মাত্র পঁচিশগজ দূরে একটা মোটর গাড়ির ভেতর ঘাপটি মেরে বসেছিল ওরা। ফ্রেডরিক আর মার্কো। ত্বজনেরই চেহারা পাল্টানো। ফ্রেডরিকের গায়ে সৌম্য বৃদ্ধের বেশ। মুখে সাদা দাড়ি। মার্কো সেজেছিল অনেকটা প্রফেসার-মাষ্টারমশাইদের মত। ওর মুখে দাড়ির বদলে মোটা গোঁফ। আর চোখে কালো ফ্রেমের ভারী চশমা। গাড়ির জানলার কাঁচগুলো ওরা বন্ধ করে তখন একদৃষ্টে হোস্টেলের দরজার দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ ফ্রেডরিক চঞ্চল হয়ে উঠল—সাবধান মার্কো ঐ যে রাফায়েল।

কথাটা শোনা মাত্র মার্কো সামনে সান হুডটা নামিয়ে আড় চোখে

দেখল, রাফায়ো ওদের ঠিক বিপরীত রাস্তার ডান ধারের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে।

—বুঝেছি। ফ্রেডরিকের নিচু সতর্ক গলা। একটু আগে যে কালো ছেলেটা হোস্টেলে ঢুকল সেই হচ্ছে গাউতাম।

মার্কো বাঁকা ভাবে হাসল।—তা আর বলতে? ঐ বাপধনকেই যে কষ্ট করে এতো দূর খাগলে আগলে নিয়ে এসেছে চাঁদু তা ওর মুখ দেখে বুঝছ না? কি রকম জুলজুল চোখে হোস্টেলের দিকে তাকিয়ে আছে দেখো।

—কিন্তু নিশাত কোথায়? ওকে যে দেখছি না।

—ও স্যাঙ্গাত আছে নিশ্চয়ই কোন আড়ালে অবডালে। এদের কি ফন্দি ফিকির বুঝতে পারবে তুমি?

ওরা এবার চুপ হয়ে গেল। রাফায়ো এতক্ষণ ফুটপাতের ওপর পায়চারী করছিল। একটা নতুন সিগার ধরিয়ে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কি ভেবে হাঁটতে হাঁটতে হোস্টেলটা পেরিয়ে ওদের গাড়ির দিকে আসতে লাগল।

ফ্রেডরিক ও মার্কো দুজনেরই শরীর তখন শক্ত কাঠ। ওকে এদিকে আসতে দেখেই ফ্রেডরিক চটপট পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে পড়তে শুরু করে দিল। আর মার্কো ঝুঁকে গাড়ির যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে লাগলো। রাফায়ো ফ্রেডরিকের জানলার কাছে এসে পিঠ ফিরে দাঁড়ালো একটু। কিছুক্ষণ হোস্টেলের দরজাটার দিকে তাকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

—বাব্বাঃ। রুমালে মুখ মুছে ফ্রেডরিক লম্বা একটা দম নিল। রাফায়ো পাশ থেকে সরে যেতেই ফিসফিস করে বলল, আর একটু হলেই সব গুবলেট হয়ে যেত। মার্কো, খেয়াল রাখ তো ব্যাটা কোথায় যায়।

ওরা পেছন ফিরে দেখল, রাফায়ো ধীর পায়ে রাস্তার মোড়ের দিকে হেঁটে চলেছে। মোড়ে পৌঁছে আর একবার এদিক তাকিয়ে সে ডান দিকে বাঁক নিল।

—যাও মার্কো! ফ্রেডরিক এবার ঠেলা দিল ওকে। দেরী করো না তবে খুব সাবধানে।

মার্কো হাতে একটা খবরের কাগজ নিয়ে তড়াক করে নামলো গাড়ি থেকে। তারপর সেই মোড়ের দিকে ছুটে গেল।

মিনিট দশেক পর ফিরে এল সে। ফ্রেডরিকের জানলার কাছে এসে বলল, চাঁদু একটা হোটেলে উঠল ডন।, মনে হচ্ছে আজ রাতের মত ঠেক নিল সেখানে।

—হোটেলটা কোথায়?

—কাছেই।

তুমি দাঁড়াও। ফ্রেডরিক বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। পোশাকের ওপর হাত বুলিয়ে বলল, আমি তাহলে ছোড়াটাব সঙ্গে দেখা করে আসি।

—এক্ষুনি যাবে?

—নিশ্চয়ই। রাফায়ো আবার চলে আসতে পারে। তার আগেই যা করার করে নিতে হবে।

মার্কো পেছন ফিরে তাকালো। মোড়ের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, ঠিক আছে যাও। তবে বুঝে সুঝে কথা বলো। মোদ্দা ব্যাপার, ওকে রোমে নিয়ে যেতে হবে, ব্যাস।

গৌতম বাইরে এসে ফ্রেডরিকের দিকে প্রশ্ন সূচক দৃষ্টিতে তাকাল—আপনি আমায় খুঁজছেন?

মৃদু হাসল ফ্রেডরিক।—তোমার নাম কি গাউতাম মজুমদার?

—হ্যাঁ। আমার নাম গৌতম মজুমদার। আপনি?

—আমি রোম থেকে আসছি, ইয়ং ম্যান। আমার নাম উইলিয়াম। আমাকে, মহাশয় ডন ফ্রেডরিক পঠিয়েছেন। তুমি কি ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ওঁকে এই টেলিগ্রামটা করেছিলে?

ফ্রেডরিকের হাতে ওর নিজের করা টেলিগ্রামটা দেখে এবার সহজ হল গৌতম। হেসে বললল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি করেছিলাম। বুঝেছি আপনি নিশ্চয়ই মহম্মদ জামিলের চিঠিটা নিতে এসেছেন?

—না আমি তোমাকেই নিতে এসেছি।

—আমাকে ? গৌতমের চোখ মুখ কুঁচকে উঠল।

—হ্যাঁ। মহাশয় ফ্রেডরিক তোমার খবর পেয়েই আমায় হুকুম করেছেন তোমাকে এই মুহূর্তে তার কাছে নিয়ে যেতে।

—কেন, আমি গিয়ে কি করবো ? চিঠিটা তো আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

আবার অমায়িক ভঙ্গিতে হেসে উঠল ফ্রেডরিক। ঘাড় নেড়ে বলল, তা নয় ইয়াং ম্যান। মহাশয় ফ্রেডরিককে তুমি চেন না। ভীষণ ধার্মিক হৃদয়ের ভদ্রলোক। তার ওপর অতিথি পরায়ণ। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের বড্ড ভালোবাসেন তিনি। ঐ জন্যই তো সবুর সইল না। তারটা পেয়েই আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি অচিরে তোমার দর্শন পেয়ে প্রীত হতে চান।

গৌতম এহেন ভারত-প্রিয় ভদ্রলোকের কথা শুনে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেল। একটু কেশে বলল, বেশতো আমি তার কাছে নিশ্চয়ই যাব তবে এক্ষুনি নয়। আপনি চিঠিটা নিয়ে চলে যান। আমি এখান থেকে ভিয়েনা ভেনিস হয়ে রোমে আসছি। তখন ওঁর সঙ্গে দেখা করব।

—তাতে বড্ড দেরী হয়ে যাবে না ? ফ্রেডরিক কপালে হাত ঘষল—তুমি যদি আগে রোম গিয়ে তারপর ভেনিস ভিয়েনা যাও, খুব অসুবিধে হবে কি ?

—অসুবিধে বলতে আপনি হয়তো জানেন আমি বেড়ানোর উদ্দেশ্যেই ইয়োরোপে এসেছি। তাই এটা নষ্ট করে অন্য কিছু এক্ষুনি করতে চাই না। আমি যে রুট ধরে এখন চলছি সেটা এ মুহূর্তে রোম গেলে মাটি হয়ে যাবে। এদিকে আর হয়তো আসাই হবে না। তাই দয়া করে ঐ অনুরোধটুকু আমায় করবেন না।

গৌতমের কথাগুলো শুনে ফ্রেডরিক একটু চিন্তিত হল। এর পর আরো বললে ছেলেটা হয়তো অন্য কিছু ভাববে। তাই সে একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, তোমার মিউনিখ দেখা কি শেষ হয়ে গেছে ?

—না। কালকের দিনটা আরো থাকব। তারপর পরশু সকালে ভিয়েনা চলে যাব।

—বেশ তাই হবে। ফ্রেডরিক মাথা ঝাঁকাল, তুমি আমাদের গাড়িতেই ভিয়েনা যেও।

—আপনার গাড়িতে ?

—আমার মানে মহামান্য ফ্রেডরিক সাহেবের গাড়িতে।

—না না না। তা কেন ? আপনি ফিরে যান শুধু আমার জন্য আটকে থেকে লাভ কি ? আমি তো কয়েক দিনের মধ্যেই রোমে পৌঁছচ্ছি।

—অসম্ভব। তা হয় না। তোমার জন্য কি চাকরিটা আমি খোয়াব ? স্বয়ং ফ্রেডরিক সাহেব আমাকে পঠিয়েছেন। দেরী হয় হবে। কিন্তু তা বলে তোমাকে না নিয়ে আমি রোমে ঢুকছি না। ঠিক আছে তাহলে ঐ কথা রহল পরশুদিন সকালে। কিন্তু কোথায় দেখা হবে আমাদের ?

গৌতমের এরপর আর বলার কিছু থাকে না। ও আর বলবেই বা কি ? কেউ যদি এ রকম নাছোড়বান্দা হয় রাজি না হয়ে উপায় নেই।

তবু ও আর একবাব বলল, মিষ্টার উইলিয়াম আমি এখানে আর একদিন থাকছি। তারপর ভিয়েনা ও ভেনিসেও আরো দুদিন করে থাকব। আপনি কি আমার সঙ্গে এতদিন ঘুরবেন ?

—হ্যাঁ ঘুরব। এছাড়া উপায় কি ? তোমাকেও তো জায়গাগুলো দেখতে হবে। তবে যাইহোক আমরা এক সঙ্গেই রোমে ফিরব। তুমি তাহলে পরশু সকাল আটটা নাগাদ মিউনিখ-ভিয়েনা অটোবানের ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে থেকো। আমি সেখান থেকে তোমায় তুলে নেব।

—অটোবান ?

—হ্যাঁ। মানে হাইওয়ে। তোমার কাছে মিউনিখের কোন ম্যাপ আছে ?

—আছে।

—বার কর। আমি জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

ফ্রেডরিক ইয়ুথ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আসতেই মার্কো গাড়ির দরজা খুলে ষ্টিয়ারিং-এ বসল। ফ্রেডরিক বসল পাশে।

গাড়িটা চালিয়ে মার্কো চিন্তিত ফ্রেডরিকের দিকে তাকাল—কি ব্যাপার, কথা হয়েছে?

—হয়েছে, কিন্তু—ফ্রেডরিক তারপর সব বলল ওকে। গৌতমের সঙ্গে ওর যা কথা হল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে।

শুনে মার্কোরও সারা মুখে কালো ছায়া নেমে এল। রাস্তায় বাঁক নিয়ে সে বলল, ছোঁড়াটাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলে না?

—না। ভিয়েনা ভেনিস না দেখে ও রোম যাবে না।

—তাহলে?

—তাহলে আর কি। ভিয়েনার পথে ওকে আমাদের গাড়িতে তুলে নিতে হবে।

—আর রাফায়ো? ও যে ছোঁড়াটার পেছনে ছায়ার মত ঘুরছে সেটা মগজে আছে?

—হুঁ চিন্তার কথা সেটাই। ফ্রেডরিক হাতে হাত ঘষল।—কিন্তু এখন পরিস্থিতি যা এছাড়া উপায়ও নেই। আপাতত খুব সাবধানে থাকতে হবে। রাফায়ো যাঁতে আমাদের ঘুণাক্ষরেও চিনতে না পারে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। তারপর দেখব কি করা যায়।

মার্কো ভাবতে ভাবতে গাড়িটা এবার তীব্র বেগে চালিয়ে দিল

পরের দিন সকাল ছটা থেকে রাফায়ো একটা গাড়ি নিয়ে ইয়ুথ হোস্টেলের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটা ভাড়া করা। ওর ধারণা গৌতম আজ নিশ্চয়ই মিউনিখ ছাড়বে। নিশাত ওকে সাবধান করে দিয়েছিল, ছেলেটা যে কোন জায়গা থেকে হিচ হাইকিং শুরু করে দিতে পারে। সেজন্যই রাফায়োর এই গাড়ি ভাড়া করা। গৌতম যদি

হাইওয়েতে গিয়ে কোন মোটরের লিফট নেয় তাহলে এই গাড়ি করেই সে ওকে অনুসরণ করতে পারবে। আর যদি হাইওয়ের পরিবর্তে স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়ে তাহলে তো কথাই নেই। গাড়িটা তখন স্টেশনে ছেড়ে সেও ট্রেনে চড়বে। পরে গন্তব্য স্থানে গিয়ে গাড়ির কোম্পানীকে একটা ফোন করে দিলেই হল। তারা তখন লোক পাঠিয়ে ওটা নিয়ে যাবে। ওদের কাছে রাফায়োর গাড়ি ভাড়া বাবদ সাতদিনের টাকা আগাম দেওয়া আছে।

কিন্তু রাফায়ো সকাল সাতটা নাগাদ দেখল গৌতম ওর রুকস্যাকটা না নিয়েই হোস্টেল থেকে বেরুচ্ছে। তখন সে বিরক্তিতে ছটফট করে উঠল। তাহলে ছোঁড়াটা আজও মিউনিখ ছাড়বে না। মনে মনে ওকে বিশ্রী গালাগাল দিয়ে গাড়ির মধ্যেই গুম হয়ে বসে রইল সে। কারণ এখন আর ওর পেছনে ফেউ সেজে লাভ নেই। তার চেয়ে নিজের হোটেলে গিয়ে বসে থাকা ভাল। হোটেল থেকে হোস্টেলের ওপর ভালই নজর রাখা যায়। রাফায়ো গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

কিন্তু ওদিকে রাস্তার মোড় থেকে একই দৃশ্য দেখে ফ্রেডরিক ও মার্কো দুজনেই নিশ্চিন্ত হল। ওরাও বসে ছিল একটা মোটরের ভেতর। গৌতমের পিঠে রুকস্যাক না দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দুজন। যাক ছেলেটা তাহলে সত্যি কথাই বলেছে। আজ মিউনিখ সে ছাড়ছে না।

গৌতম একটা ট্রামে উঠে যেতেই ওরাও ফিরল ওদের আস্তানায়।

•

পুরো দিনটা গৌতমের দোয়েস মিউজিয়াম দেখতে কেটে গেল। মিউজিয়ামটা এত বড় আর এখানে যন্ত্রপাতি বলতে আস্ত রেলের ইঞ্জিন ও সাক্ষাত এরোপ্লেন থেকে নিয়ে কত কিছু যে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেগুলো তাদের বিশদ কার্য্য প্রণালী সহ ঘুরে ঘুরে দেখতে দিনের পর দিন লেগে যায়। তবে গৌতম সকাল নটা থেকে পাঁচটার মধ্যেই সব মোটামুটি দেখে নিল।

তারপর ও পায়ে হেঁটে মিউনিখ শহরের শোভা দেখতে দেখতে গেল ইউনিভারসিটি মেনসাতে। আজ সকালেও সে মিউজিয়াম যাওয়ার

পথে এখানে খুব সস্তায় জল খাবার খেয়েছিল। এই জায়গার উল্লেখ ইয়োরোপ সংক্রান্ত একটা বইয়ে পাওয়া গেছে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের বয়সী যে কোন লোককে সস্তায় খাবার দেওয়া হয়।

সকালে এখানে খেতে বসে একটা মজার ঘটনা ঘটে ছিল। গৌতম তখন বাইরের স্লট মেসিনে পয়সা ফেলে কুপন কেটে ওর পছন্দের খাবারগুলো নিজের হাতে নিজেই তুলে টেবিলে বসে খাচ্ছিল। ওব খাবারের মধ্যে ছিল একটা সসেজ-স্যাণ্ডউইচ ও এক পেয়ালা কফি। পেয়ালাটা সুন্দর প্লাষ্টিকের। আর তাতে চিনি গোলার চামচটা আবো সুন্দর কাঁচেব তৈরী। খাওয়া দাওয়া সেবে যে যার পাত্রগুলো ডাষ্টবিনে ফেলে চলে যাচ্ছিল।

গৌতমের যখন খাওয়া প্রায় শেষ একটি বাঙ্গালী ছেলে এসে ওর সামনে বসল।

—ভারতীয় ? ইংরেজীতে জিজ্ঞেস কবল সে।

—হ্যাঁ। গৌতম উত্তর দিল।

—ভারতবর্ষের কোথায় থাক ?

—শিলিগুড়ি।

—বাঃ তাহলে তুমি বাঙ্গালী ? তারপর বেশ কিছুক্ষণ গল্প হল ওব সঙ্গে। ছেলেটি এখানে চাকরি করে। রোজ এই মেনসাতে খেতে আসে।

গৌতম খাওয়া শেষ হতেই ছেলেটিকে ওর প্লেট ও পেয়ালাটা দেখিয়ে আস্তে আস্তে বলল, এগুলো তো সব ফেলে দিতে হবে, কিন্তু এই চামচটা ?

—ওটাও ফেলে দিতে হবে।

—তাই নাকি ?

অগত্যা গৌতম উঠে সব ফেলে দিল। আর ফেলতে গিয়ে দেখল সত্যি গাদা গাদা ওরকম চামচ ডাষ্টবিনে ভুর হয়ে পড়ে আছে।

পরে ছেলেটি ওকে গল্পে গল্পে বলল, ব্যাপারটা কি জান। জার্মানিতে লোকের যে অভাব সেটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। তবে এর সঙ্গে আরো

একটা অর্থ নৈতিক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। এই যে আমরা খাবার খেয়ে পাত্রগুলো সব ফেলে দিচ্ছি এগুলো ধুয়ে মুছে আবার ব্যবহারের উপযোগী করতে যে লোকের প্রয়োজন তার মাইনের খরচ এই জিনিস পত্র নষ্ট হওয়ার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ এখানে যে কোন লোকের এক মাসের মাইনে এত বেশী যে আমরা তা ছমাসেও ভাবতে পারি না।

সেই দেশেই এক মার্ক সত্তর ফেনিং অর্থাৎ মাত্র সাড়ে তিন টাকায় সুন্দর ডিনার খেয়ে ইউনিভারসিটি মেনসা থেকে বেরিয়ে পড়ল গৌতম। অবশ্য ছেলেটার কথা মত এই খাবারই যদি সে এমন কোন রেষ্টুরেণ্টে বসে খেত যেখানে সেলফ-সার্ভিসের বদলে কোন বেয়ারা এসে ওগুলো ওকে পরিবেশন করত, তাহলে এর দাম হত অন্তত তিনগুণ বেশী। তার কারণ ঐ দামের মধ্যে থাকত সেই বেয়ারার মাইনেরও একটা অংশ।

তার পরের দিন ঠিক কথা মতই ঘটনাটা ঘটল। গৌতম সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ভিয়েনা অটোবানের নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওর আশেপাশে তখন আরো অনেক হিচ হাইকার। প্রত্যেকেই গাড়ির লিফট্ নেওয়ার জন্য উন্মুখ। কেউ হাতে কাগজে ভিন অর্থাৎ ভিয়েনা লিখে দাঁড়িয়ে, কেউ ছুটন্ত গাড়ি দেখলেই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে ব্যস্ত আবার কেউ তীব্র গাড়িগুলো আরো কোথায় আস্তে হতে পারে হাইওয়ের ওপর এমন জায়গা খুঁজতে তৎপর।

গৌতম এদের চেয়ে একটু দূরে আলাদা ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক আটটার সময় ফ্রেডরিকের গাড়িটা এসে থামল।

—গুড মর্নিং। গাড়ি থেকে না নেমে ফেডরিক ভেতরে বসেই পেছনের দরজাটা খুলে দিল।

গৌতম ওর অভিবাদনের উত্তর দিয়ে রুকস্যাক নিয়ে ভেতরে বসল।

রাফায়ো দূর থেকে দেখল ব্যাপারটা। গৌতমকে পেরিয়ে বহুদূরে রাস্তার ডান ধারের একটা সরু সাইড-ষ্ট্রীটে সে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর হাতে তখন শক্তিশালী একটা দূরবীন। সেই দূরবীনের সাহায্যে ও

দেখল গৌতম একটা গাড়িতে উঠছে। কিন্তু ফ্রেডরিক ও মার্কোকে সে চিনতে পারল না। ওদের গাড়িটা বড় রাস্তায় বেগ নিতেই সেও ষ্টীয়ারিংয়ে বসল। ওদিকে মার্কোও গাড়ির ভেতর থেকে একটা ছোট দূরবীন চোখে লাগিয়ে রাফায়েলোকে লক্ষ্য করে নিয়েছে। কিন্তু রাফায়েলোর হাতে দূরবীন দেখে তক্ষুনি সে সাবধান হয়ে গেল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই জার্মানী-অস্ট্রীয়া বর্ডার। পাসপোর্ট চেকিং ও মানি এক্সচেঞ্জের কাজটা সেরে তার আধ ঘণ্টা পর সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা শহর সালজবুর্গ। গৌতমের অনুরোধে মার্কো কিছুক্ষণের জন্য অটোবান ছেড়ে সেই ছোট্ট শহরে ঢুকল। চারপাশে একটা গোল চক্কর দিয়ে তারপর আবার ভিয়েনা হাইওয়ে। এবার আর কোন বিরতি নয়। এখান থেকে ভিয়েনা তিনশ কিলোমিটারের পথ। সামনের আয়নায় রাফায়েলোর গাড়িটাকে একবার লক্ষ্য করে মার্কো এক্সিলরেটরে পায়ের চাপ দিল। গাড়ির কাঁটা একশর ঘর পেরিয়ে আস্তে আস্তে আরো ওপরে উঠতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালানোর পর মার্কো ইটালিয়ান ভাষায় ফ্রেডরিককে বলল, যা দেখছি পেছনের লেজটা কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না। এখন কি করবে ডন?

—আপতত ভিন চল। শহরে ঢুকে তারপর আর একবার ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করো। ফ্রেডরিক আড় চোখে সামনের আয়নার দিকে চেয়ে নির্দেশ দিল।

ভিন ৬

কিন্তু শহরে ঢুকেও রাফায়েলোর চোখ থেকে অদৃশ্য হবার সাধ্য ওদের হল না। মার্কো অনেক চেষ্টা করল। কখনো বাঁ দিকের, কখনো ডান দিকের রাস্তাগুলোতে হঠাৎ হঠাৎ বাঁক নিয়ে আবার কখনো গাড়ির ভিড়ের মধ্যে মিশে বহুবার সে ওর নাগাল থেকে পালিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু প্রতিবারই সে সামনের আয়নায় রাফায়েলোর গাড়ির ছায়া দেখে হতাশ হল। তখন ফ্রেডরিক ওকে ইটালিয়ান ভাষায় সাবধান করল,

মার্কো আর নয়! রাফায়ো এবার বুঝতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ছেলেটিকে এখন হোস্টেলে নামিয়ে দাও। বলেই সে পেছন না ফিরে গৌতমকে উদ্দেশ্য করে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন ইয়ুথ হোস্টেলেই যাবে তো?

—না। হোস্টেলে এখন ঢোকা যাবে না। মাত্র বারোটা বাজে। গৌতম ঝুঁকে জবাব দিল। আপনি আমাকে রেলওয়ে স্টেশনে নামিয়ে দিন। ওখানে রুকস্যাকটা লকারে রেখে শহরটা আমি একটু ঘুরে নেব। তারপর বিকেল নাগাদ যাব হোস্টেলে।

ফ্রেডরিক ও মার্কো পরস্পরের দিকে তাকাল। এ আবার আর এক ঝক্কি। তার মানে ওদের কাউকে এখন স্টেশনের কাছা-কাছি থাকতে হবে। কিন্তু কি আর করা যায়, পেছনে রাফায়োর যাতে কোন সন্দেহ না হয় তাই করতে হবে। তা না হলে এখন কি ওরা গৌতমকে ছাড়ত, এই গাড়িতেই ওকে দিব্বি শহর ঘোরান যেত।

অনিচ্ছাসত্বেও রেলওয়ে স্টেশনের কাছে গিয়ে গাড়িটা থামাল মার্কো।

ফ্রেডরিক গৌতমকে জিজ্ঞেস করল তুমি এখানে কালকের দিনটাও থাকবে নাকি?

—হ্যাঁ। পরশু সকালে ভেনিস যাব।

—ঠিক আছে। আমরা তার আগেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। গুডবাই।

—গুডবাই। রুকস্যাকটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল গৌতম।

মার্কো গাড়িটা আবার তীব্র বেগে চালিয়ে দিল। তারপর একটু এগিয়ে বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকে ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল চটপট।

—খুব সাবধানে মার্কো! রাফায়োকে খেয়াল রেখো। ফ্রেডরিকের সতর্ক বাণী শুনতে শুনতে সে ছুটে গেল স্টেশনের দিকে।

তার প্রায় আধ ঘন্টা পর ফিরে এল সে। ফ্রেডরিক শুনল ওর কাছ থেকে, গৌতম স্টেশনের লকারে রুকস্যাকটা রেখে ট্যুরিস্ট কাউন্টার

হয়ে এইমাত্র একটা ট্রামে চড়ে কোথাও চলে গেছে। আর রাফায়ো যথারীতি এখন স্টেশনের চত্বরেই ঘোরা ফেরা করছে। অর্থাৎ যতক্ষণ না গৌতম আবার ওর রুকস্যাকটা নিতে ফিরে আসছে, ততক্ষণ সে সেখানে থাকবে।

ওরাও দুজন আলোচনা করে তাই ঠিক করল। গৌতম স্টেশনে না ফেরা অবধি মার্কোও স্টেশন ছাড়বে না। তবে হ্যাঁ ওকে থাকতে হবে রাফায়োর চোখ বাঁচিয়ে খুব সাবধানে।

মোদ্দা কথা গৌতমকে কেউই আর ধরা ছোঁয়ার বাইরে করতে চাইছে না। তাই প্রত্যেকের দৃষ্টি এখন ওর ঐ রুকস্যাকটার দিকে।

শহরটা মোটামুটি ঘুরে বিকেল চারটের মধ্যেই ফিরে এল গৌতম। স্টেশন থেকে ওর রুকস্যাকটা নিয়ে তারপর আবার সে ট্রামে উঠল। যথারীতি রাফায়ো ওর গাড়ি নিয়ে সেই ট্রামের পেছন-পেছন চলতে শুরু করল। আর মার্কো ফ্রেডরিকের কাছে না ফিরে নিল একটা ট্যাক্সি।

অবশেষে ইয়ুথ হোস্টেলে গৌতমকে পৌঁছিয়ে তারপর ওরা নিশ্চিন্ত হল। মার্কো এবার ফ্রেডরিকের খোঁজে ওর নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে গেল। রাফায়ো তখন খুঁজতে শুরু করল হোস্টেলের কাছাকাছি একটা হোটেল।

দানিয়ুব নদীর ধারে ভিয়েনা শহর বড় শান্ত ও সুন্দর। এখানকার ইয়ুথ হোস্টেলেরও তেমনি ধীর গম্ভীর পরিবেশ। গৌতম তখন হোস্টেলে ওর সীট দখল করে হাত মুখ ধুয়ে বাইরের লনে বসে ছিল। এমন সময় একটা পরিচিত গলা ভেসে এল ওর কানে।

—হে। আবার তুমি? দারুণ ব্যাপার।

গৌতম তাকিয়ে দেখল ওর সামনে এণ্ডারসন দাঁড়িয়ে।

—বাঃ তুমি এখানে কবে এলে?

—আজ একটু আগে। এণ্ডারসন ওর পাশে বসল। আর তুমি?

—আমিও এই এলাম কিন্তু তুমি কোথা থেকে আসছ?

—এখন আসছি সালজর্গবু থেকে। কাল রাতে ছিলাম মিউনিখে।

—মিউনিখে! কোথায় ইয়ুথ হোস্টেলে?

—না আমি ইন্টারন্যাশনাল হাউসে ছিলাম। ওখানে ছাত্রদের থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে।

—তাই বল। আমিও তো কাল মিউনিখে ছিলাম। অবশ্য ইয়ুথ হোস্টেলে।

—তাই নাকি? তাহলে রোমে তুমি এক দিনের বেশী থাকনি?

গৌতম মৃদু হাসল।—রোম আমি এখনও যাই নি।

—যাওনি! এণ্ডারসন ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। প্যারিস থেকে তুমি তাহলে কোথায় গিয়েছিলে?

—ফ্রাঙ্কফুর্ট। ঐ খামটার জন্যই তোমার খোঁজে গিয়েছিলাম। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। ওটা আমি পেয়ে গেছি। ভাগ্যিস ওটা তুমি ইয়াসিনকে দিয়েছিলে। তা না হলে সত্যি খুব মুশকিল হত।

—তুমি প্যারিস থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তুমি নিজে না এসে ওকে হোস্টেলে পাঠিয়েছিলে কেন?

—কাকে? গৌতম কিছু বুঝতে পারল না।

—তোমার সেই মিশরীয় বন্ধুটিকে। তুমিই তো ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে?

—আশ্চর্য্য! ওকে আমি পাঠাতে যাব কেন? ও তো এমনিতেই ফ্রাঙ্কফুর্ট গিয়েছিল। তারপর তোমার সঙ্গে ওর হঠাৎ স্টেশনে দেখা হয়ে গেলো। তুমি ওকে খামটা দিলে।

এবার এণ্ডারসনের অবাক হবার পালা। গৌতমের চোখে চোখ রেখে একটু বিরতি নিয়ে সে বলল, ও কি তোমাকে তাই বলেছে?

—হ্যাঁ।

—বুঝেছি। এণ্ডারসন একটা দীর্ঘ দম ছেড়ে বলল, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। তুমি তাহলে জান না, ও নিজে ফ্রাঙ্কফুর্ট ইয়ুথ হোস্টেলে

গিয়ে ভোর পাঁচটা নাগাদ আমাকে বিছানা থেকে তুলিয়ে বলেছে খামটার জন্য ওকে নাকি তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছ।

গৌতম শুনে হতবাক। ইয়াসিন এরকম কথা বলেছে? কিন্তু ও খামটার কথা জানল কি করে? তাছাড়া এটার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? কিছু বুঝতে না পেরে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

এবার এণ্ডারসন ওকে জিজ্ঞেস করল। কার খাম ওটা, কি ব্যাপার? গৌতম সব বলল ওকে? কায়রোর মহম্মদ জামিল থেকে সুরু করে মিউনিখে মিস্টার ফ্রেডরিকের পাঠানো লোক উইলিয়াম অবধি। ইয়াসিন ওরফে নিশাতের সম্বন্ধে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে এণ্ডারসন বলল, তোমার যদি আপত্তি না থাকে খামটা আমি দেখতে পারি?

—নিশ্চয়ই। গৌতম ওর পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলে বার করল ওটা। এই নাও।

খামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে এণ্ডারসন মুচকি হাসল।—যা ভেবেছি তাই। এর ভেতরের সবকিছু তোমার ঐ মিশরীয় বন্ধুটির দেখা হয়ে গেছে।

—কি বলছ! গৌতম চমকে উঠল।

—হ্যাঁ। এই দেখ। ওপরের সীলগুলো খুলে তারপর আবার যে লাগান হয়েছে তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে।

তাই তো! খামের সীলমোহরের দিকে ভাল করে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল গৌতম। সীলগুলো দু'এক জায়গায় একটু ভাঙা-চোরা। কিন্তু এর অর্থ ও কিছুই বুঝতে পারল না। ইয়াসিন মিথ্যে বলে এণ্ডারসনের কাছ থেকে খামটা নিয়ে এভাবে ভেতরের সব কিছু দেখল কেন সে রহস্য ওর কাছে একটা হেঁয়ালী। গৌতম চিন্তায় পড়ল।

—মহম্মদ জামিল কি তোমার পরিচিত কেউ? এণ্ডারসন জিজ্ঞেস করল আবার।

—হ্যাঁ। কায়রোতে আলাপ হয়েছে। খুব ভাল ভদ্রলোক।

—আর মিঃ ফ্রেডরিক, ইনি কে?

—ইনিও শুনেছি ধার্মিক ও পরোপকারী লোক।

—বুঝেছি। এণ্ডারসন থুতনিতে হাত রাখল। আমার মনে হয় কি জান, তোমার এই ইয়াসিন ছেলেটির কোন বদ মতলব আছে। এমন হতে পারে মহম্মদ জামিলের সঙ্গে ওর কোন শত্রুতা রয়েছে। মহম্মদ জামিল তোমায় যে চিঠিটা মিস্টার ফ্রেডরিককে দিতে দিয়েছেন ওটার মধ্যে হয়তো এমন কোন খবর আছে যেটা ইয়াসিন জানতে পারলে এরা খুবই বিপদে পড়বে। সে জন্যই,ও বোধহয় কায়রো থেকে তোমার পেছু নিয়েছে। যাই হোক আমার মতে এখন ব্যাপারটা মিস্টার ফ্রেডরিকের পাঠানো ঐ ভদ্রলোকটিকে জানানো উচিত।

গৌতম নড়েচড়ে বসল। ভাবতে ভাবতে বলল, ঠিক আছে। ভদ্রলোক এলেই ওনাকে আমি সব খুলে বলব। কিন্তু আমি ভাবছি ও কি করে জানল যে চিঠিটা আমি তোমার ব্যাগের ভেতর ভুলে ছেড়ে দিয়েছি।

—এটা এমন কিছু ব্যাপারই নয়। একটা বদমতলবী ছেলে কায়রো থেকে তোমার পেছু নিয়েছে। তারপর ও দুদিন তোমার সঙ্গে দিন রাত কাটিয়েছে। এই চিঠিটা যদি ওর লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে তোমার অগোচরে তোমার সব জিনিসপত্র সে ঘাটতেও পারে। নিশ্চয়ই তখন ও কিছু টের পেয়েছে। যাক, ওসব কথা এখন ছাড়। ব্যাপারটা যখন তোমার নয় যাদের তাদের সব জানিয়ে দিলেই হবে। এণ্ডারসন উঠে দাঁড়াল। এখন চল এই সুন্দর সন্ধেটা মাটি না করে আমরা স্টাটসোপারে গিয়ে ভিয়েনার বিখ্যাত অপেরা দেখে আসি।

—চল। গৌতম উঠল। একটু চিন্তিত পদক্ষেপে এণ্ডারসনের সঙ্গে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

বাফায়ো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর হোস্টেলের কাছেই একটা পছন্দসই হোটেল পেয়ে গেল। সেই হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে প্রথমেই সে জানলায় দাঁড়িয়ে দূরবীনে দেখে নিল ইয়ুথ হোস্টেলটা এখান থেকে কি রকম দেখা যায়। দেখে নিশ্চিন্ত হল। সব কিছুই স্পষ্ট।

এবার সে হাঁপ ছেড়ে একটা সোফায় বসল। যাক এখন

একটু জিরোন যাবে। টানা চার ঘণ্টা গাড়িটার পেছু নিয়ে মানসিক ও শারীরিক দুদিক দিয়েই ভীষণ ক্লান্ত রাফায়ো। বিশেষ করে গৌতমের গাড়িটা যখন ভিয়েনা শহরে ঢুকে হঠাৎ পাগলা ঘোড়ার মত ছুটতে শুরু করেছিল তখন ওর ওপর একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণ ওরকম ছুটলেই খেই বোধহয় হারিয়ে ফেলত সে। কিন্তু হঠাৎ গাড়িটা ওরকম ছুটল কেন? রাফায়ো কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

মিনিট পাঁচেক বসার পর হঠাৎ ওর খেয়াল হল নিশাতকে একটা ফোন করতে হবে। গতকাল মিউনিখ থেকে ওর সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে রাফায়ো। কিন্তু ওকে পায়নি। কেন পায়নি সেটাও একটা চিন্তার বিষয়।

রাফায়ো ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে রোমের সেই হোটেলটা চাইল, যেখানে নিশাতের ওঠার কথা।

রিসিভার রাখার কিছুক্ষণ পরেই ফোনটা বেজে উঠল। হোটেল অপারেটরের গলা।—আপনার নাম্বার স্যার। কথা বলুন।

রাফায়ো নিশাতকে চাইল। একটা খট করে শব্দ তারপরেই ওর গলা ভেসে এল—নিশাত বলছি।

—আমি রাফায়ো।

—রাফায়ো! নিশাতের অস্থির স্বর। আমি তোমার জন্যই বসে আছি। রাফায়ো, এদিকে সব গোলমাল হয়ে গেছে। ফ্রেডরিক আর ওর সাঙ্গো-পাঙ্গো কেউ নেই সেই ঠিকানায়।

—কি বলছ তুমি?

—হ্যাঁ। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল পরশুদিন অবধি ওরা ওখানে ছিল। তারপরই সব হাওয়া।

—তার মানে ওখানে তোমার পৌঁছনোর ঠিক আগেই?

—যা বলেছ।

—কিন্তু ব্যাপারটা হল কি করে?

—বুঝতে পারছি না। তবে কাল সারাদিন সারারাত আমি

মার্তিনোর সঙ্গে রোম পুরো ছেঁকে ফেলেছি। কোথাও ওদের টিকিও খুঁজে পাই নি। শুধু এইটুকু জানা গাছে ঐ ঠিকানায় পরশুদিন অবধি ফ্রেডরিক, মার্কো, রিচার্ড তিন জনই ছিল।

খবরটা শুনেই রাফায়োর মুখের রং পুরোপুরি পালটে গেল। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। এত কাঠখড় পুড়িয়ে ফ্রেডরিকের গোপন ঠিকানাটা উদ্ধার করে শেষ পর্য্যন্ত এই সংবাদ। ফোঁস ফোঁস করে কয়েকটা ঝোড়ো নিশ্বাস ফেলল রাফায়ো। তারপর আবার রিসিভারে ঝুঁকে বলল, নিশাত, মার্তিনো এখন কোথায় ?

—ও এখনও ওদের খোঁজে ব্যস্ত। রাত দশটায় এখানে আসবে

—ঠিক আছে। তখন আমি আবার ফোন করব।

রাফায়ো ফোনটা ছেড়ে দিল। কপালে চিন্তার ভাজ নিয়ে আরো কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াল সে! ফ্রেডরিক পরশু থেকে নিখোঁজ। অর্থাৎ ঘটনাটা ঘটেছে নিশাতের ওখানে পৌছনোর ঠিক আগেই। এতদিন সে ঐ অজ্ঞাতবাসে থেকে ঠিক এই মুহূর্তে জায়গাটা ছাড়ল কেন ? এই রহস্যময় প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে খুঁজতে রাফায়ো আবার ফিরে এল সোফায়।

মার্কো ইয়ুথ হোস্টেল থেকে আবার সেই রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ফিরে গেল। ফ্রেডরিক ওর অপেক্ষায় সেখানে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

—ছোড়াটাকে হোস্টেলে ঢুকিয়ে এসেছি ডন। এবার চল আমরাও একটা আস্তানা যোগাড় করি। মার্কো গাড়ির দরজা খুলে ওর পাশে বসে বলল।

—রাফায়ো এখন কোথায় ? ফ্রেডরিক জিজ্ঞেস করল।

—হোটেল খুঁজছে। মনে হয় এতক্ষনে পেয়েও গেছে।

—কোথায় উঠল লক্ষ্য করলে না ?

—না ওটা করা গেল না। মার্কো গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে বলল, ও ব্যাটা মিউনিখ থেকে দূরবীন লাগিয়ে আমাদের অনেকবার দেখেছে। এর পর আবার দেখলে সন্দেহ করতে পারে। তাই চলে এলাম।

—তা অবশ্য ঠিক। ফ্রেডরিক মাথা ঝাঁকাল।

—কিন্তু ডন, এরপর রাফায়োকে ঝেড়ে ফেলার কোন উপায় বার করেছ?

—করেছি। ফ্রেডরিকের শান্ত স্বর। আমরা ছেলেটাকে নিয়ে কাল রাতের অন্ধকারে এখান থেকে কেটে পড়ব।

—পরশু সকালের বদলে, কাল রাতে? ফন্দিটা মন্দ নয়। কিন্তু ও রাজি হবে?

—না হওয়ার কি আছে। আমাদের সঙ্গে ওর যখন একটা পরিচয় হয়ে গেছে সে আমি করিয়ে নিতে পারবো।

—বেশ। কিন্তু রাফায়োর হাতের শক্তিশালী দূরবীনের কথা ভুললে চলবে না।

—হুঁ, এ ব্যাপারে আমাদের একটু সাবধান হতে হবে।

কথা বলতে বলতে ওরা কিছুদূর গিয়ে একটা ভাল হোটেল দেখে গাড়িটা দাঁড় করাল। রাফায়ো ইয়ুথ হোস্টেলের কাছাকাছি থাকায় ওদিকে আর ওদের যাবার ইচ্ছে ছিল না।

তারপর রাত নটা নাগাদ ফ্রেডরিক একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল গৌতমের সঙ্গে দেখা করতে। এবার বেশভূষাটা অন্যরকম করে নিয়েছিল সে। যাতে রাফায়ো লক্ষ্য করলেও সকালের সেই গাড়ির আরোহী হিসেবে ওকে যেন চিনতে না পারে।

গৌতম ইয়ুথ হোস্টেলের বাইরে চত্বরে এসে ফ্রেডরিককে দেখে প্রথমে একটু অবাক হলেও চিনতে পারল। ফ্রেডরিক ওকে নিয়ে আরো আড়ালে সরে গেল।

—আপনি এখন এসে খুব ভাল করেছেন! গৌতম একটু উত্তেজিত স্বরে বলল, আপনার সঙ্গে খুব দরকারী কথা আছে।

—বল। ফ্রেডরিক প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

—কায়রোর ইয়াসিন নামে কাউকে চেনেন আপনি?

—ইয়াসিন ? না, কি রকম দেখতে সে ?

গৌতম নিশাতের বর্ণনা দিল। ফ্রেডরিকের মুখের ভাব নিমেষেই বদলে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে সে বলল, ওর সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছে ?

—প্যারিসে। আমার সঙ্গে বন্ধু সেজে দুদিন সে ঘুরেছে সেখানে। কিন্তু এখন দেখছি ও একটা ধাপ্পাবাজ। ও মহম্মদ জামিলের পাঠান চিঠিটা ধাপ্পা দিয়ে এক জায়গা থেকে নিয়ে খুলে দেখেছে।

—দেখেছে ! ফ্রেডরিক শুনে শক্ত কাঠ।

—হঁ্যা চিঠিটার মধ্যে কি কোন গোপন ব্যাপার আছে ?

—গোপন ব্যাপার ? না না না, গোপন আবার কি হবে। ফ্রেডরিক এবার জোর করে সহজ করল নিজেকে। একটু হেসে বলল, আমার সাহেব যেমন প্রকৃতির লোক, মনে হয় না, এমন কিছু হতে পারে। ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলবে কি ?

গৌতম তখন সংক্ষেপে ওর ব্যাগ বদলের ঘটনা আর ফ্রাঙ্কফুর্টে এণ্ডারসনের কাছে নিশাতের যাওয়ার ব্যাপারটা সব ওকে বলল।

ফ্রেডরিক সব শুনে ভেতর ভেতর বেশ বিচলিত হয়ে উঠল। তবে চেহারায় অন্য রকম উৎকণ্ঠা দেখিয়ে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এর রহস্য কি ? তবে যাইহোক এখন আর অনর্থক দেরি না করে রোম গিয়ে ব্যাপারটা ফ্রেডরিক সাহেবকে শীঘ্রই জানানো উচিত। বলা তো যায় না কোথা থেকে কি হয়ে যায়। বিশেষ করে চিঠিটা যখন ব্যক্তিগত। এ বিষয়ে আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দেব ?

—বলুন।

—কাল তুমি ভিয়েনা শহরটা দেখে নাও। তারপর শুধু শুধু রাতটা এখানে না কাটিয়ে চল আমরা সন্ধের পরই ভেনিস রওনা হয়ে পড়ি। সেখানে গেলেই ওনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে।

—কি ভাবে ?

—রোম থেকে ভেনিস খুব বেশী দূরে নয়। ফোনে একটা খবর দিলেই তিনি চলে আসবেন।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। গৌতম রাজি হয়ে গেল।

—তাহলে শোন। ফ্রেডরিক স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কাল তুমি সারাদিন সব ঘুরে রাত নটা নাগাদ ফাইন আর্টস মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো। আমি ওখান থেকে তোমায় তুলে নেব।

—কেন, এখানে এলেঁ ভাল হয় না? গৌতম সরল ভাবে বলল।

—এখানে আসতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে। ওখানেই ভাল। ফ্রেডরিক অমায়িক ভঙ্গিতে ওকে বোঝাল। কাল মঙ্গলবার ফাইন আর্টস মিউজিয়াম কাল রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তুমি নিশ্চয়ই জান ভিয়েনায় অনেক কিছু দেখার আছে, সামার প্যালেস, বিটোভেন মিউজিয়াম, মোজার্ট মিউজিয়াম, এমিউজম্যাণ্ট পার্ক, বেলভেডের প্যালেস, ফাইন আর্টস মিউজিয়াম। এতো সব একদিনে দেখা যায় না। তাই বলছি কাল সারাদিনে সবকিছু দেখার পর শেষে তুমি ফাইন আর্টস মিউজিয়ামে যেয়ো। রাত আটটা থেকে নটা ওটা তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তারপর তুমি বাইরে এসে দাঁড়িও। তোমার রুকস্যাকটা তখন কোথায় থাকবে? নিশ্চয়ই এখানে?

—তা তো বটেই। ওটা নিয়ে কি আর শহর ঘোরা যায়।

—ভাল কথা। মিউজিয়াম থেকে তাহলে আমরা এখানে চলে আসব। তারপর তোমার রুকস্যাক নিয়ে ভেনিস, তাই ভাল না?

গৌতম ঘাড় নাড়ল।—ঠিক আছে তাই হবে।

হাসিমুখে এবার বিদায় নিল ফ্রেডরিক।

ফ্রেডরিক যখন ইয়ুথ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে গেল, রাফায়ো তখন ওর হোটেলে বসে রোমে নিশাতের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে।

—নিশাত, মার্তিনো এসেছে?

—হ্যাঁ। নিশাতের সন্ত্রস্ত গলা। খবর বড় গুরুতর রাফায়ো।

—কেন, কি হল?

—মার্তিনো খোঁজ নিয়ে জেনেছে পরশু ফ্রেডরিকের কাছে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল।

—ফ্রাঙ্কফুর্ট ?

—হ্যাঁ। ঐ ছেলেটার কীর্তি। তার বয়ান মার্তিনো লোক লাগিয়ে পোষ্ট অফিস থেকে বার করেছে। ওর মধ্যে নাকি ছেলেটার মিউনিখ ভিয়েনা আর ভেনিস ঘুরে রোম আসার সংবাদ ছিল।

রাফায়েোর মগজে যেন বিত্যুতের একটা শিহরণ খেলে গেল। মুহূর্তে ঘেমে উঠল সে। তাহলে এই ব্যাপার? তাহলে কি ওই টেলিগ্রামটা পেয়েই ফ্রেডরিক রোম থেকে নিখোঁজ হয়েছে? কিন্তু কেন? কোথায় গেল সে তারপর? ভাবতে ভাবতে রাফায়োর মনে হঠাৎ একটা পুরনো দৃশ্য ভেসে উঠল। ভিয়েনায় ঢুকে গৌতমের গাড়িটার সেই পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে যাওয়ার ঘটনাটা। ওটা মনে পড়তেই রাফায়ো শক্ত স্থির হয়ে গেল। তাইতো! গাড়িটা তখন ওভাবে হঠাৎ ছুটতে গেল কেন? কি ব্যাপার? রাফায়োকে কাটানোই কি ওর উদ্দেশ্য ছিল?

—কি হল রাফায়ো? কিছুক্ষণের বিরতির পর নিশাত ওপার থেকে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল।

—শোন নিশাত। রাফায়ো আবার ঝুঁকে পড়ল রিসিভারের ওপর। এই মুহূর্তে বেরিয়ে পর তুমি। এয়ারপোর্টে গিয়ে এখানকার কোন প্লেনে চেপে সোজা আমার কাছে চলে এস।

—তোমার কাছে!

—হ্যাঁ। এখানে এলে পর সব কথা হবে। রাফায়ো ওর হোটেলের ঠিকানাটা দিয়ে আবার বলল, দেরি কর না চটপট।

ফোনটা রেখে একটা নতুন সিগার ধরাল রাফায়ো। তারপর আস্তে আস্তে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। ওর মাথায় তখন একটি প্রশ্নই বার বার টোকা মারছে। মিউনিখ থেকে যে গাড়ি করে গৌতম ভিয়েনায় এল তার তুজন আরোহী কি ফ্রেডরিক আর মার্কো?

মার্কো হোটেলের ঘরে বসে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। ফ্রেডরিক ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সে।—রাজি হয়েছে ছোঁড়াটা?

—হয়েছে। ফ্রেডরিকের দৃষ্টি চিন্তিত। একটু থেমে বলল, কিন্তু

ঘটনা আরো সাংঘাতিক ঘটে গেছে। তুমি শুনলে আঁতকে উঠবে, রাফায়ো আমাদের রোমের ঠিকানা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে।

—বল কি ? মার্কো সত্যিই ভীষণ চমকে উঠল।

ফ্রেডরিক তখন ওকে গৌতমের ঘটনাটা বিশদ ভাবে বলল।

সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল মার্কো। রুদ্ধ শ্বাস নিয়ে বলল, বুঝেছি ! সে জন্যেই নিশাতকে আমরা রাফায়োর সঙ্গে দেখছি না। তার মানে ও নিশ্চয়ই এখন আমাদের খোঁজে রোম চষে বেড়াচ্ছে।

—ঠিক। জামিলের চিঠি থেকে আমাদের ঠিকানাটা উদ্ধার করে ও যে রোম গেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এখন রাফায়োর কাজ হচ্ছে এই ছোঁড়াটাকেও সেখানে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঘটনা যে কত মারাত্মক, বুঝেছ এবার ? রোমের ঐ আস্তানাটা সময় মত গুটিয়ে খুব বেঁচে গেছি আমরা। আর একটু হলেই ওরা কেল্লা ফতে করে ফেলত।

—যাক, তাহলে এখন কি করবে ?

—এখন আর কোন ঝুঁকি নয়। ফ্রেডরিক কোচের ওপর পা তুলে বলল, ছেলেটা কাল রাতে যেতে রাজি হয়েছে। ওকে খুব সাবধানে তুলে নিতে হবে। তারপর ভেনিস নয় এখান থেকে সোজা ইনসব্রুক।

—ইনসব্রুক ! কেন, ওখানে কি ?

—রিচার্ডকে আমি ট্রাঙ্ককল করে দিচ্ছি। লেডিকে নিয়ে একটা হেলিকপ্টারে করে ও যেন কাল রাতের মধ্যেই ওখানে পিয়াজোর ভিলাতে চলে আসে ! আমরা সেখানেই কাজটা সেরে ফেলব।

মার্কো একটু থমকে ফ্রেডরিকের চোখে চোখ রাখল। —বুঝেছি তুমি আর একদম দেরি করতে চাও না ?

—শুধু তাই নয়। ইনসব্রুক অস্ট্রিয়ার মধ্যে। রিচার্ডের এমনিতেই ওখানে চলে আসা উচিত। কারণ রাফায়োর চর সারা ইটালিতে ছড়িয়ে আছে। নিশাত যদি আমাদের খোঁজে রোম গিয়ে থাকে তাহলে আর বেশীক্ষণ ইটালিতে লেডিকে রাখা বিপজ্জনক।

—তা অবশ্য ঠিক। মতলবটা তোমার খারাপ নয়। কিন্তু ডন, আমি এখন রাফায়োর কথা আবার ভাবছি। মার্কো থুতনিতে হাত

ঘষতে ঘষতে বলল, ও যে ইয়ুথ হোস্টেলের কাছে কোথায় ওৎ পেতে আছে, আমরা কিছুই জানিনা। রাতের বেলা হলেও আমার নিশ্চিত ধারণা ছোঁড়াটার ওপর ওর নজর ঠিকই থাকবে। তখন ওর চোখ বাঁচিয়ে ছোঁড়াটাকে গাড়িতে তোলা কি সম্ভব হবে?

—তুমি কি ভাবছ, সে ভয় আমার মগজে নেই? ফ্রেডরিক বাঁকা ভাবে হাসল—ছোঁড়াটাকে আমি মারিয়া-থেরেসিয়ান প্লাজের ফাইন আর্টস মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়াতে বলেছি। ওর রুকস্যাকটা তখন হোস্টেলে থাকবে। ওখান থেকে ওকে নিয়ে আমাদের হোস্টেলেই যাওয়ার কথা। আমি নির্ঘাত বলতে পারি যেহেতু ওই রুকস্যাকটা হোস্টেলে থাকবে রাফায়েো ওর পেছু নিতে হোটেল থেকে আর বেরোবে না। ও হোটেলেই বসে অপেক্ষা করবে ছেলেটার ফিরে আসার জন্য। কিন্তু ছেলেটা হোস্টেলে আর ফিরবে না। ওকে নিয়ে আমরা ওই মিউজিয়াম থেকেই কেটে পড়ব। ও যাতে রাস্তায় বেশী গণ্ডগোল না করে সে জন্য কিছু দূর গেলেই তুমি ওকে গাড়ির ভেতর বেঁহুশ করে ফেলবে। ব্যাস, রাফায়োকে কলা দেখানোর এটাই হচ্ছে এক মাত্র পন্থা।

মার্কো সব শুনতে শুনতে দীর্ঘ একটা দম ফেলল। তারপর সেও মুচকি হাসল। হাতে একটা তুড়ি মেরে বলল, বেঁহুশ করে ফেলব। ঠিক বলেছ ডন। বেড়ে মতলব। নাও নাও রিচার্ডকে তাহলে এক্ষুনি ট্রাঙ্ককল করে দাও। আর দেরি কর না।

ফ্রেডরিকও হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।

পরের দিন ভোর পাঁচটার মধ্যেই নিশাত ভিয়েনায় এসে পৌঁছল। এয়ারপোর্ট থেকে ও যখন হোটেলে এল রাফায়ো তখন জানলায় দাঁড়িয়ে দূরবীন নিয়ে ব্যস্ত।

নিশাত ঢুকল ঘরে। রাফায়ো বুঝতে পারল। দূরবীনের ভেতর তাকিয়েই সে বলল, এস নিশাত। তুমি খুব ভাল সময় পৌঁছেছ।

—কি দেখছ, ছেলেটাকে? নিশাত এগিয়ে এল।

—ছোঁড়াটা এখনও হোস্টেল থেকে বেরোয় নি। আমি দেখছি আশে পাশে ফ্রেডরিকের কোন টিকি পাওয়া যায় কিনা।

—আচ্ছা! ও ব্যাটা তাহলে এখানে হাজির। নিশাতের বক্র স্বর।

—আমার সঙ্গে এখনও মোলাকাত হয়নি। তবে একটা আভাস পাওয়া গেছে। রাফায়েো এক পলকের জন্য দূরবীন থেকে চোখ নামিয়ে আবার ওঠাল। তারপর চারপাশে ভাল করে চোখ ঘুরিয়ে বলল, মনে হচ্ছে ওরা কেউ এই মুহূর্তে আশে পাশে নেই। অবশ্য আমার মত কাছাকাছির কোন হোটেলে যদি থাকে তাহলেই মুশকিল। যাইহোক সাবধানে যেতে হবে। নিশাত তুমি আগে বেরিয়ে পড়। ওই যে বাড়িটা দেখছ, ওটাই ইয়ুথ হোস্টেল। একটু নজর রেখে যেয়ো। ওই রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও আমি আসছি।

—অত ভাবছ কেন? আমার তো ভোল পালটানোই আছে।

—খবরদার! রাফায়েো আবার দূরবীন থেকে চোখ নামিয়ে বলল, ফ্রেডরিক কিন্তু জানে যে আমরা ছোঁড়াটার পেছন পেছন আছি।

—তাই কি! নিশাত চমকে উঠল। কিন্তু কি করে সম্ভব হল এটা?

—তা জানি না। তবে আজ সকালে ওরা আমাকে কাটানোর খুব চেষ্টা করেছে। সে সব কথা পরে হবে। এখন তুমি যাও। ওই রাস্তার মোড়ে তুমি পৌছলে আমি বেরোব। মোদ্দা কথা ছোঁড়াটাকে আজ আর চোখ ছাড়া করছি না। নিশাত বেরিয়ে গেল। রাফায়েো তাকিয়ে রইল হোস্টেলের দিকে। নিশাত ওখানে পৌঁছনোর আগেই গৌতম হোস্টেল থেকে বেরোয় কিনা সেটাই এখন ওর লক্ষ্য।

নিশাত মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। রাফায়েো ওকে দেখেই দূরবীন নামিয়ে নিল চোখ থেকে। তারপর ঘর ছেড়ে লিফটে করে হোটেলের নীচে এসে গাড়িতে বসল। অবশ্য এ গাড়ি গতকালের সেই ভক্সওয়াগন নয়। এটা গত রাতে ভাড়া করা। এখনকার গাড়ির রংও আলাদা কোম্পানীও আলাদা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে নিশাতের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নিশাত টুক করে উঠে পড়ল গাড়ির ভেতর। তারপর দুজন গৌতমের অপেক্ষায়

ঘাপটি মেরে বসে রইল। তার আগে রাফায়ো গাড়ি থেকেই দূরবীনে চোখ লাগিয়ে আশেপাশের এলাকাটা ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিয়েছে। অবশ্য ফ্রেডরিক ও মার্কো কেউই ওর নজরে পড়ল না।

ঠিক আটটা বেজে দশে গৌতম হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে এণ্ডারসন। এণ্ডারসনকে দেখে চমকে উঠল নিশাত।—সেকি, এই ছেলেটা আবার এখানে!

—কার কথা বলছ? ওর ঐ সঙ্গীর? দূর থেকে তুজনের দিকে তাকিয়ে রাফায়ো জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। ওই তো এণ্ডারসন। ফ্রাঙ্কফুর্টে যার কাছ থেকে জামিলের চিঠিটা আদায় করলাম।

—ও তাই নাকি। তাহলে তোমার বুজরুকিটা ছোঁড়াটার কাছে এখন ফাঁস হয়ে গেছে, এই তো?

—তা কি আর বাকি আছে? তুজন আবার যখন এক হয়েছে সে সব কথা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

—ভালই হয়েছে। এবার দেখ ছোঁড়াগুলো কোথায় যায়। রাফায়ো দূরবীনটা নিশাতের হাতে দিয়ে নিজে ষ্টিয়ারিংএ বসল।

রাত নটার মিনিট দশেক পর ফ্রেডরিক আর মার্কো গাড়ি নিয়ে ফাইন আর্টস মিউজিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াল। মার্কো প্রথমে গাড়ির ভেতর বসে ওর ছোট্ট দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল একবার, তারপর ফ্রেডরিক নামল নিচে।

গৌতমও মিউজিয়ামের উঁচু সিঁড়ি থেকে ফ্রেডরিককে দেখতে পেয়ে তর তর করে নিচে নেমে এল। ওর সঙ্গে এণ্ডারসন। ওকে দেখে থমকে গেল ফ্রেডরিক।

—একটা কথা ছিল মিষ্টার উইলিয়াম। গৌতম ওর কাছে এসে বেশ নম্র স্বরে বলল।

—বল।

—এ হচ্ছে আমার বন্ধু এণ্ডারসন।

ফ্রেডরিক বাধ্য হয়ে হাত বাড়াল। এণ্ডারসনের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, আমার নাম উইলিয়াম। হাউ-ডু-ইউ-ডু।

—হাউ-ডু-ইউ-ডু। এণ্ডারসন সৌজন্য মূলক হাসি হাসল।

গৌতম বলল এবার—মিষ্টার উইলিয়াম এণ্ডারসনও আজ আমার সঙ্গে ভেনিস যাবে। আপনার কোন আপত্তি নেই তো ?

ফ্রেডরিক আঁতকে উঠল। কথাটা শোনামাত্র ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল যেন। এই শেষ মুহূর্তে কি বলছে ছেলেটা ? ওদের সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়ার মতলব ?

নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিল ফ্রেডরিক। মুখে দুঃখ প্রকাশের ভাব এনে বলল, ইস্ কাথাটা যদি তুমি কালও বলতে। আমার আপত্তি হবে কেন, কিন্তু আজ দুপুরে এখানে আমার দুজন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, ওরাও আমার সঙ্গে যাবে বলেছে। ওদের কথা দিয়ে ফেলেছি, আমার গাড়িটা আবার ছোট। কিছু মনে কর না এণ্ডারসন।

—না না, তাতে কি হয়েছে। এণ্ডারসন কাঁধ ঝাঁকাল। আমি বরং ট্রেনে চলে যাই। রাত এগারোটায় একটা ট্রেন আছে। ভেনিসে সকাল দশটায় পেঁছিয়। এণ্ডারসন গৌতমের দিকে ফিরে বলল, গাউতাম কিছু ভেবো না। তোমার সঙ্গে ভেনিসে ঠিক দেখা করব।

গৌতমের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এণ্ডারসনের সঙ্গে আজ সারাদিন ঘুরে ওর ভীষণ ভাল লেগেছে। এই একটি দিনেই ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব এত গাঢ় হয়ে গিয়েছিল যে ওরা আজ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এরপর দুজন একসঙ্গেই ইয়োরোপে ঘুরে বেড়াবে। তার গোড়াতেই ছাড়াছাড়ি ? না, তা হয় না। গৌতম একটু বিরতির পর ফ্রেডরিকের দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে এক কাজ করুন মিষ্টার উইলিয়াম, আমিও এণ্ডারসনের সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছি। এক রাতের ব্যাপার তো। আপনি বরং ভেনিসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তাই ভাল না ?

সর্ব্বনাশ! ফ্রেডরিকের কলজে যেন ছলকে উঠল। তা কি করে সম্ভব ? একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও আমি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে নিই। বলেই গাড়ির কাছে গিয়ে মার্কোর সঙ্গে

ইটালিয়ান ভাষায় কয়েকটা কথা সেরে আবার ছুটে এল।—চল চল গাড়িতে উঠে বস তোমরা। ফ্রেডরিক এবার তাড়া দিল ওদের। গৌতমের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না তা কি হয়। তুমিও যাবে তোমার বন্ধুও যাবে। আমি দুজন বন্ধুকে বরং অন্য কিছুতে চলে যেতে বলব।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ তা কেন? গৌতম প্রতিবাদ করে উঠল। ওদের আপনি কথা দিয়েছেন। আমরা তো—

—চলে এস, চলে এস। ও নিয়ে ভেব না। ফ্রেডরিক গৌতমের হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বলল, ওরা আমার বন্ধু কিছু মনে করবে না। কিন্তু তুমি ফ্রেডরিক সাহেবের অতিথি তোমাকে না নিয়ে গেলে আমার গর্দান যাবে। এস ভাই এণ্ডারসনের দিকেও তাকাল সে।

অগত্যা দুজন বসল গাড়িতে। ওরা পেছনের সিটে। ফ্রেডরিক সামনে। মার্কো গাড়িতে ষ্টার্ট দেওয়ার আগে আধো অন্ধকারে আড় চোখে একবার দেখে নিল এণ্ডারসনকে।

তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। কিন্তু ফ্রেডরিক ও মার্কো দুজনেই বিন্দুমাত্র টের পেল না যে ওদের গাড়িটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গাড়ি রাস্তার আর এক দিক থেকে বাঁক নিয়ে ওদের পেছু পেছু ধাওয়া করল।

মার্কো ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল।

কিছুদূর যেতেই এণ্ডারসন হঠাৎ দুপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি? ইয়ুথ হোস্টেল তো এদিকে নয়।

—ইয়ুথ হোস্টেল পরে যাব। ফ্রেডরিক পেছন ফিরে বিনয়ের সুরে বলল, তার আগে আমার বন্ধুদের বলে আসি। এখনই খবরটা দিলে ওরা অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারবে। তাই নয় কি?

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এণ্ডারসন আবার সিটে গা এলিয়ে দিল।

কিন্তু গাড়িটা আরো কুড়ি মিনিট চলার পর যখন দুপাশের ঘর বাড়ি

সব ফাঁকা হতে লাগল তখন এণ্ডারসন আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার বন্ধুদের বাড়ি কোথায় ?

—ভিয়েনার একটু বাইরে। ফ্রেডরিক অস্থির দৃষ্টিতে মার্কোর সঙ্গে চোখাচোখি করে জবাব দিল, শহরতলি এই এসে গেল বলে।

তার কিছুক্ষণ পরেই গাড়িটা হঠাৎ একটা শব্দ করে আস্তে আস্তে রাস্তার এক পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি হল ? ফ্রেডরিক এবার ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল মার্কোকে।

—এঞ্জিনে কিছু একটা গড়বড় হল মনে হচ্ছে। মার্কোও ইংরেজীতে জবাব দিল, দাঁড়াও দেখছি।

মার্কো নামল নিচে। তারপর সামনে গিয়ে গাড়ির বনেটটা খুলে খুট খাট কি সব নাড়াচাড়া করতে লাগল। এদিকে পাশ দিয়ে তখন হুশ হুশ করে একটার পর একটা গাড়ি ছুটে চলেছে।

কয়েক সেকেণ্ড যন্ত্রপাতিগুলো দেখে বনেটটা বন্ধ করে মার্কো ফ্রেডরিকের জানলার কাছে এসে এবার ইটালিয়ান ভাষায় বলল, ডন তুমি ষ্টিয়ারিঙে সরে যাও। গিয়ার, এক্সিলরেটর সামলে বসে থাক আমি বললেই গাড়িটা চালিয়ে দেবে।

ফ্রেডরিক ওর কথা মত চালকের আসনে সরে গেল।

মার্কো এবার পিছিয়ে এসে এণ্ডারসনকে বলল, তুমি একটু নামবে ? গাড়িটা ঠেলতে হবে।

—নিশ্চয়ই। এণ্ডারসন দরজা খুলে নামতে গেল।

গৌতম বলল, আমিও নামছি।

—না না কোন দরকার নেই। এণ্ডারসন নামার পর মার্কো ধপ করে দরজাটা বন্ধ করে বলল, সামান্য একটু ঠেলা দিলেই হবে। তুমি বস। তারপর ফ্রেডরিককে উদ্দেশ্য করে সে ইটালিয়ান ভাষায় বলল, সাইড লাইটগুলো নিভিয়ে দাও।

আলোগুলো নিভতেই জায়গাটা ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল। এণ্ডারসন গাড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল। মার্কোও এল। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে ঘটে গেল ঘটনাটা। বেচারা এণ্ডারসন এক মুহূর্ত আগেও

কিছুই বুঝতে পারল না। যেই ও গাড়িটাকে ঠেলার জন্য একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, অমনি শক্তিশালী মার্কোর একটা জব্বর ঘুষি এসে পড়ল ওর কানের পাশে। সেই ঘুষির চোটে অপ্রস্তুত এণ্ডারসন ছিটকে রাস্তার ধারের ঢালু জমির ওপর গিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে মার্কো ছুটে গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে ফ্রেডরিককে বলল, চালাও!

ফ্রেডরিক তৈরীই ছিল। গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে একটা জোর ঝাঁকুনি নিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলল আবার।

গৌতম ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল—কি হল? এণ্ডারসন কোথায়? বলেই ও পেছন ফিরে তাকাতে গেল, কিন্তু ফেরা আর হল না। তার আগেই মার্কো ওর কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট স্প্রে-গান বার করে কি যেন ছিটিয়ে দিল গৌতমের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে গৌতম জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সিটের ওপর।

ফ্রেডরিকের গাড়িটা এণ্ডারসনকে নামানোর জন্য যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার প্রায় একশ গজ পেছনে ছিল রাফায়োর গাড়ি। রাফায়ো ফ্রেডরিকের গাড়ির পেছনের নম্বরটাকে শুধু লক্ষ্য করতে করতে সেই মিউজিয়াম থেকে এতক্ষণ ছুটে আসছিল। হঠাৎ ফ্রেডরিক ওখানে থামতেই সেও সাবধানে রাস্তার এক ধারে সাইড স্ট্রীটে সরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে ওরা দূরবীন দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল সামনের গাড়িটা কি করে। কিন্তু অন্ধকারে অত দূর থেকে গাড়ির শুধু পেছনের তুটো লাল আলো ও নাম্বার প্লেট ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর পেছনের সেই আলো তুটোও নিভে গেল। নাম্বারটাও তখন উধাও। রাফায়ো আর নিশাত তুজনেই এবার বিচলিত হয়ে উঠল। ওরা এমনিতেই ফ্রেডরিককে ভেনিসের বদলে আবার সালজবুর্গের দিকে ফিরতে দেখে বেশ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর এখন এরা গাড়িটাকে ওই ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করিয়ে কি করছে বুঝতে না পেরে আরো অস্থির হয়ে উঠল। এর মধ্যে হঠাৎ আরেকটা গাড়ি ছুটে গেল এদিক

থেকে। তারপরেই দেখা গেল দুটো গাড়িই আলো জ্বেলে পাশাপাশি ছুটছে। ছুটতে ছুটতে একটা গাড়ি বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। আর একটা চলে গেল সোজা। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ এমন ভাবে ঘটল যে তার মধ্যে কোনটা ফ্রেডরিকের ওরা দুজনেই আঁচ করতে পারল না। কারণ রাস্তাটা ঠিক ওই জায়গায় একটু বাঁকা ছিল।

থতমত খেয়ে গাড়িতে ষ্টার্ট দিল রাফায়ো। তীব্র গতিতে রাস্তার সেই বাঁকে এসে আবার থামল।

মার্কোর ঘুষিটা বেশ জোরেই লেগেছিল এণ্ডারসনের মুখে। মাটিতে পড়ে মাথাটা ওর ঝিমঝিম করছিল। মিনিট দুয়েক মড়ার মত পড়ে থাকার পর হঠাৎ একটা পরিচিত গলা শুনে সে চমকে উঠল।

গাউতামের সেই অ্যারাবিয়ান বন্ধু ইয়াসিন না? এণ্ডারসন নিঃশব্দে মাথাটা তুলে উঁচু জমির ওপর দিয়ে রাস্তায় উঁকি মারল। দেখল, ওদের গাড়িটা যেখানে দাঁড়ান ছিল তার কিছুটা দূরে আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার সামনের সিটে মানুষের দুটো ছায়া মূর্তি। দুজন গাড়ির দরজা খুলে কথা বলছে। ওদের মধ্যে একজন যে ইয়াসিন সেটা ওর গলা শুনেই বোঝা গেল।

ইয়াসিন অর্থাৎ নিশাত তখন গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলছে, রাফায়ো আমার মনে হয় গাড়িটা সোজাই গেছে বাঁ দিকে নয়।

—তুমি কি তা হলপ করে বলতে পার? রাফায়োর ঝাঁঝাল স্বর।

—তা নয় কিন্তু বাঁদিকের রাস্তাটা তো কোনো গ্রামে গেছে বলে মনে হয়, ওরা ওদিকে যাবে কেন?

—আমাদের ভাঁওতা দেবার জন্য যেতেও পারে।

—ওরা কি আমাদের কথা টের পেয়েছে?

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। এমন হতে পারে আমরা সোজা চলে গেলে ওরা বাঁদিক থেকে বেরিয়ে আবার ভিয়েনার দিকে ফিরে যাবে।

নিশাত এবার কিছু বলল না। রাফায়ো তখন হাতে একটা টর্চ নিয়ে রাস্তার ওপর ঝুঁকে কি সব দেখছে। ফ্রেডরিকের গাড়িটা

যেখানে দাঁড়ান ছিল সেদিকেও দু তিনবার সে এল। এণ্ডারসন আবার মড়ার মত মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল। রাফায়োর তীব্র টর্চের আলোর আভাস ওর দিকেও ছিটকে চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ নিশাত বলে উঠল, ওই দেখ রাফায়ো বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি আসছে।

তাই তো। রাফায়ো ঘুরে দেখল দুটো আলোর বিন্দু ছুটে আসছে ওদিক থেকে। —নিশাত এগিয়ে যাও। গাড়িটাকে দাঁড় করাতে হবে।

নিশাত এগিয়ে গেল। রাফায়োও পেছু নিল ওর।

এণ্ডারসন এর মধ্যে স্থির করে ফেলেছে কি করবে। এরা যে গৌতমের গাড়িটাকে অনুসরণ করছে সেটা ওর কাছে এখন স্পষ্ট। তাই রাফায়ো আর নিশাত যেই সামনের দিকে চলে গেল ও হামাগুড়ি দিয়ে উঁচু জমিতে উঠে গাড়িটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে এল। তারপর ছোট রাস্তার ছুটন্ত গাড়িটা ওদের দুজনের কাছে এসে দাঁড়াতেই ও টুক করে রাফায়োর গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

রাফায়ো আর নিশাত ছোট রাস্তার গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা সেরে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল নিজেদের গাড়ির কাছে। ফ্রেডরিকের গাড়িটা সোজাই গেছে। ওই ড্রাইভারটা ওদের বলল, যে গাড়িটা একটু আগে এই ছোট রাস্তা দিয়ে গেছে সেটা 'মার্সিডিজ'। অথচ ফ্রেডরিকের গাড়িটা ছিল 'রিনল্ট'।

রাফায়ো আবার গাড়ির চালকের আসনে এসে বসল। নিশাত বসল পাশে। তারপরেই বুলেটের মত সোজা ছুটে চলল ওরা।

এণ্ডারসন তখন পেছনের সিটের পা-দানিতে বুক ঠেকিয়ে শরীর কাঠ করে নিঃশব্দে শুয়ে আছে।

টানা আধ ঘণ্টা তীব্র বেগে গাড়ি চালানোর পর ফ্রেডরিকের গাড়ির হদিশ পাওয়া গেল। রাফায়ো গাড়ির গতি এবার একটু কমিয়ে নিশাতকে বলল, দূরবীনটা চোখে নাও আমি কাছে আর যাচ্ছি না।

নিশাত দূরবীন চোখে নিল। তারপর ওদের গাড়ির দিকে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি রেখে বলল—কিন্তু রাফায়ো, ওরা ওখানে অতক্ষণ দাঁড়াল কেন সেটা এখনও বোঝা গেল না।

রাফায়ো এক্সিলরেটরে পায়ের চাপ কমিয়ে বলল, মনে হচ্ছে আমরা ওদের পেছু করছি কিনা সেটা পরখ করার জন্যই—

—তা হতে পারে। নিশাত সায় দিল ওর কথায়। তাহলে তুমি এরপর একটু সাবধানে থেক। ওরা যদি আবার দাঁড়ায় থেমো না। সোজা বেরিয়ে যেয়ো। তারপর একটা ভাল জায়গায় থেমে ওখান থেকেই আমরা ওদের ওপর নজরে রাখবো।

রাফায়ো ঘাড় নাড়ল। ঠিক বলেছে নিশাত।

এণ্ডারসনকে রাস্তায় ছেড়ে আর গৌতমকে বেহুঁশ করে ফ্রেডরিক বেশ কিছু দূর নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি চালাল। তারপর হঠাৎ ওর খেয়াল হল। এতক্ষণ ছেলে ছুটোকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ওরা পেছন দিকটা ঠিক লক্ষ্য করতে পারেনি। যদিও রাফায়ো মনে হয় এখন ভিয়েনার হোটেলে গৌতমের অপেক্ষায় বসে আছে, তবু একবার দেখতে হবে কেউ ওদের পেছু করছে কিনা। সাবধানের মার নেই। ফ্রেডরিক গিয়ার চেঞ্জ করে মার্কোকে বলল, গাড়িটা দাঁড় করাচ্ছি। পেছন ফিরে দেখ আর কোন গাড়ি দাঁড়ায় কিনা।

মার্কো বেহুঁশ গৌতমের লুটিয়ে পরা দেহটাকে পাশে সরিয়ে পেছন দিকে তাকাল। পকেট থেকে ছোট দূরবীনটা বার করে চোখে লাগিয়ে দেখল, পরপর কতকগুলো হেড লাইটের সারি। সব ছুটে আসছে এদিকে। ফ্রেডরিক সাইড লাইট জ্বালিয়ে গাড়িটা আস্তে আস্তে ডান দিকে দাঁড় করাল। মার্কোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন পেছন দিকে। কিন্তু ও দেখল বহু দূর অবধি কোন হেডলাইটই নিভল না। সব গুলোই হুশ হুশ করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

এ ধরনের পরীক্ষা ওরা সালজবুর্গ পর্য্যন্ত বেশ কয়েকবার করল। প্রথম বার অবশ্য রাফায়োদের গাড়িটা ওদের পেছনে সত্যি ছিল না। কিন্তু তার পরের প্রতি বারই রাফায়ো এ ব্যাপারে খুব সাবধান হয়ে

গিয়েছিল। ফ্রেডরিকের গাড়িটা দাঁড়ালেও সে আর পেছন দিকে থামত না। ওদের পেরিয়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে তারপর কোন অন্ধকার সুরক্ষিত জায়গায় নিজেদের লুকিয়ে পেছন ফিরে ওদের ওপর লক্ষ্য রাখত।

দেখতে দেখতে সালজবুর্গ এসে গেল। ফ্রেডরিক এবার সোজা না গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। অর্থাৎ ইনসব্রুকের দিকে। এখন সে বেশ নিশ্চিন্ত। ওদের কেউ পেছু নিচ্ছে না এই ধারণায় অনেক হালকা মনে সে গাড়ি চালিয়ে গেল।

এরপর আল্পসের আরো দুরুহ রাস্তা। টানা দু ঘণ্টা সেই পাহাড়ী রাস্তা পেরিয়ে ইনসব্রুক শহরের কাছাকাছি এসে ফ্রেডরিক হঠাৎ ডান দিকের একটা ছোট রাস্তায় ঢুকল।

তখন ঘড়িতে রাত তিনটে।

ফ্রেডরিকের গাড়িটা সেখানে বাঁক নিতেই রাফায়ো ব্রেক কষে ছোট রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—ঠিক আছে আর এগিও না।. ছোট রাস্তার ছুটন্ত লাল আলো দুটোর দিকে তাকিয়ে নিশাত বলে উঠল, রাস্তাটা ফাঁকা কিন্তু ওরা যাচ্ছে কোথায়?

—পিয়াজোর ভিলায়।

—তাই নাকি। ওটা এখানে?

—হ্যাঁ। রাফায়ো গম্ভীর মুখে নিশাতের হাত থেকে দূরবীনটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। তারপর একটা উঁচু জমির ওপর উঠে বেশ কিছুক্ষণ ডান দিকে তাকিয়ে থাকল।

—গাড়িটা থেমে গেছে। রাফায়ো চটপট ফিরে এসে নিশাতের পাশে বসল আবার। ষ্টার্টার টেনে বলল, ভিলাটা বেশী দূরে নয় বোধহয়। এবার যাওয়া যাক। ডান দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে আলোগুলো না জ্বালিয়েই তারপর সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

ওই ছোট রাস্তাটা গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে। সেটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বিরাট এলাকা। তার ভেতর বিস্তৃত বাগান, লন, সুইমিংপুল, তারপর একটা হাল-ফ্যাশানের দোতলা বাংলো। এটাই

পিয়াজো ভিলা। পিয়াজো ইয়োরোপের একজন কুখ্যাত লোক। সে ফ্রেডরিকের বন্ধু। কিন্তু এখানে সে দরকার ছাড়া খুব একটা থাকে না। এখানে সব সময় থাকার জন্য আছে মাত্র একটি লোক। তার নাম জর্জ। জর্জ এই ভিলার কেয়ারটেকার, দারোয়ান সব।

ফ্রেডরিকের গাড়িটা ভিলার গেটের সামনে পৌঁছতেই জর্জ বাংলো থেকে এসে গেটটা খুলে দিল। ফ্রেডরিককে দেখে দাঁত বার করে হাসল।

—সুস্বাগতম! মিষ্টার ফ্রেডরিক।

ফ্রেডরিক মাথার হ্যাট নামিয়ে গাড়িটা চালিয়ে ভেতরে ঢুকতেই গেটটা বন্ধ করে দিল সে।

ফ্রেডরিক আর মার্কো ভেতরে ঢুকে দেখল সামনে বিশাল লনের ওপর একটা হেলিকপ্টারের ছায়া মুর্তি। তারপরেই পাশের অন্ধকার থেকে রিচার্ডের গলা ভেসে এল।—অনেক দেরি করলে তোমরা। রিচার্ড ওদের গাড়ির আরো কাছে এসে বলল, সকালের মধ্যেই এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে।

—কেন? ফ্রেডরিক গাড়ি থেকে নেমে একটু অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল।

—জর্জ বলছে কাল নাকি এই ভিলা পুলিস সার্চ করতে পারে।

—হ্যাঁ মিষ্টার ফ্রেডরিক। জর্জ এগিয়ে বিনীত স্বরে বলল, আজ দুপুরে হঠাৎ কর্তার কাছ থেকে খবর পেলাম। কাল একটু সাবধানে থাকতে হবে।

—তাই নাকি। ফ্রেডরিক শঙ্কিত হয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই ঘুরে বলল, মার্কো তাহলে আর একদম দেরি নয়।

মার্কো আর রিচার্ড এবার তৎপর হয়ে উঠল। ওরা দুজন বেহুঁশ গৌতমের দেহটাকে চ্যাং-দোলা করে গাড়ি থেকে নামিয়ে বাংলোর সামনের ঘরে ঢুকিয়ে একটা সোফার ওপর শুইয়ে দিল। জর্জ জল নিয়ে এল একটা পাত্রে। তারপর ওরা সবাই মিলে গৌতমের হুঁশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ফ্রেডরিক জিজ্ঞেস করল, লেডিকে কোথায় রেখেছ ?

রিচার্ড ডান দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, ওই ঘরে।

ফ্রেডরিক এগিয়ে গেল। সেই ঘরের দরজাটা খুলে নিঃশব্দ পায়ে ভেতরে ঢুকে দেখল, একটা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে সে।

একজন ভারতীয় বয়স্কা মহিলা। রোগাটে চেহারা। পরনে সাদা শাড়ী। এই ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার মুখে চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট।

ফ্রেডরিক বেরিয়ে এল। দরজাটা বন্ধ করে গৌতমের সোফার দিকে ফিরে গেল আবার।

পিয়াজো ভিলার গেটের এক পাশে পাঁচিলের ওপর বসে ছিল দুজন। দূরবীন হাতে রাফায়েো আর নিশাত। ওদের গাড়িটা তখন পিয়াজো ভিলার বাইরে একটা গাছের তলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

রাফায়েো ফিসফিস করে বলল, মোট চারজন মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। ওটা রিচার্ড আর একজন এখানকার লোক। নিশাত আরো নিচু স্বরে বলল।

—তার মানে রিচার্ড নিশ্চয়ই ওই হেলিকপ্টারে করে বুড়িটাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—ঠিক আছে। ভালই হল। রাফায়েো নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা তা হলে ঠিক সময় এসে পড়েছি। সাবধান নিশাত! বলেই সে অত উঁচু পাঁচিল থেকে অদ্ভুত একটা লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিশাতও।

নিচে নেমে দুজনেই কোমর থেকে বার করল দুটো পিস্তল।

—শোন! রাফায়েোর সতর্ক স্বর। হড়বড় করে কিছু করতে যেয়ো না। ওরা চারজন, মনে থাকে যেন। ঠিক সময় বুঝে হামলা করতে হবে। ওরা যখন সবাই অসতর্ক ঠিক তখন।

নিশাত ফিসফিসিয়ে বলল, সেদিকে আমারও খেয়াল আছে।

ওরা বাংলোর দিকে সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল এবার।

ওদিকে এণ্ডারসন তখন গাড়ি থেকে উঁকি মেরে রাফায়ো আর নিশাতের কার্য্য-কলাপ সব লক্ষ্য করছে। পাঁচিল থেকে যেই দুজন লাফ দিয়ে ভিলার দিকে নামল, তখন সে গাড়ির দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে গাছের আড়ালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এগিয়ে গেল সামনে। কিন্তু পাঁচিলের কাছে গিয়ে চক্ষু ওর চড়ক গাছ। এ তো বিরাট উঁচু দেয়াল! ওরা কিভাবে চড়ল এটার ওপর? এণ্ডারসন একটু ভেবে পায়ের জুতো জোড়া খুলে পাশের একটা গাছের ওপর উঠল। গাছটা যদিও পাঁচিল থেকে অনেকটা দূরে, কিন্তু তার ওপর থেকে ভিলার ভেতরের সব কিছু দেখা যায়। এণ্ডারসন আধো অন্ধকারে দেখল ভেতরে বিরাট বাগান আর লন। বাগানের এক কোণে একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোর পেছনে একটা দোতলা বাড়ি। বাড়িটা মনে হচ্ছে পুরোপুরি নির্জন। কিন্তু একটু ভাল করে তাকাতেই রাফায়ো নিশাতের ছায়া মূর্তি দুটো ওর নজরে পড়ল। তীব্র আলোয় ঝলমলে বাংলোর কাঁচের জানলার পাশে, ওরা তখন ঘোরাঘুরি করছে।

এণ্ডারসন এবার গাছ থেকে নেমে রাফায়োর গাড়ির চালকের আসনে এসে বসল। তারপর গাড়িটাকে চালিয়ে সে প্রায় নিঃশব্দে পাঁচিলের ধার ঘেষে দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজার জানলায় পা দিয়ে ওপরের ছাতে উঠতেই ওর মুশকিল আসান হল। পাঁচিলের ধারটা এবার ওর হাতের নাগালের মধ্যেই। হাত দিয়ে সেই ধারে কিছুক্ষণ ঝুলতে ঝুলতে এক সময় তার ওপর উঠেও পড়ল সে। ওপরে উঠে নিশ্চল মুর্তির মতো বসে রইল এণ্ডারসন। তার কিছুক্ষণ পর রাফায়ো আর নিশাতের ছায়া-মূর্তি দুটো যখন বাঁদিকের আড়ালে চলে গেল তখন সে ঝুলে পড়ল ওপাশে।

গৌতম চোখ খুলে ধড়মড় করে উঠে বসল সোফায়। চোখের পাতার ওপর জলের ছিটেগুলো মুছে ভালো করে তাকাল চারপাশে।

—কি হয়েছে আমার? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছেন?

—ভেনিসের খুব কাছেই। ফ্রেডরিক মৃদু হেসে নম্র স্বরে বলল। ভেনিস দারুণ জায়গা, তুমি যাবে না 'সেখানে ?

—এণ্ডারসন কোথায় ? গৌতম ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে তাকাল।

—ওব সঙ্গে ভেনিসে তোমার দেখা হবে। ফ্রেডরিক ওর আরো কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে বলল, আজ আর একটু পরেই তুমি ভেনিস রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কাজ করে যেতে হবে এখানে। খুব জরুরী কাজ।

—দাঁড়ান। গৌতমের এখন আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ল। মার্কোর দিকে ফিরে সে একটু কড়া স্বরে বলল, তুমি এণ্ডারসনকে কোথায় ফেলে এলে ? তারপর আমাকে বেহুঁশ করার কারণ ? কি মতলব তোমাদের ?

মার্কো মুখ বেঁকিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ফ্রেডরিকের ইশারায় থেমে গেল। ফ্রেডরিক গৌতমের কাঁধে একটা হাত রেখে হেসে বলল, ইয়াং ম্যান তুমি যে খুব বুদ্ধিমান ছেলে আমি জানি! ঠিকই ধরেছ, তোমাকে নিয়ে আমাদের একটা মতলব আছে। ধরে যখন ফেলেছ আর দেরি কেন, কাজটা সেরে ফেল। যা বলছি মন দিয়ে শুনে ভাল ছেলের মত করে যাও। তারপরই এখান থেকে তোমার মুক্তি। তা না হলে হবে কি জান, ঐ দেখ।

গৌতম তাকাল। সামনে পেছনে দুদিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। মার্কোর হাতে একটা পিস্তল। রিচার্ডের হাতে ধারাল ছুরি।

—শোন, সময় আমাদের খুব কম। যা বলার সংক্ষেপে বলছি। ফ্রেডরিক ডান দিকের ঘরটা দেখিয়ে হুকুমের স্বরে বলল, ওই ঘরে একটা বুড়ি শুয়ে আছে। তার কাছে যাও। ও তোমার দেশের লোক, হিন্দী ছাড়া কিছুই জানে না। ওকে বল সে যদি বাঁচতে চায়, তাহলে যেন তোমাকে মালগুলো কোথায় বলে দেয়। ওর ভাষা আমরা কিছুই বুঝি না। সে জন্যই তোমাকে এখানে নিয়ে আসা, বুঝলে ?

গৌতম এবার একটু ঘাবড়ে গেল। ফ্রেডরিকের কথা গুলো শুনে নিজের পরিস্থিতিটা বুঝতে চাইল সে। ও সত্যিই বুদ্ধিমান ছেলে।

বিগত ঘটনাগুলো পর পর মিলিয়ে নিমেষেই ও বুঝে গেল ব্যাপারটা কি। জামিল আর এই লোকগুলো যে কোন গুণ্ডা দলের লোক ও কোন বদ উদ্দেশ্য নিয়েই এরা গৌতমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সেটা এখন ওর মাথায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার মানে ওই ইয়াসিন ছেলেটা নিশ্চয়ই এদের কোন পাল্টা দলের লোক।

—কি হে ছোকরা, বসে আছ কেন? মার্কো ওর পিস্তলের আগাটা গৌতমের পিঠে বিঁধিয়ে ধমকাল, উঠে দাঁড়াও। নাকি ছুরি দিয়ে খোঁচা মেরে ওঠাতে হবে।

—আহা ও রকম ধমকিও না। ফ্রেডরিক আবার দরদ মিশ্রিত স্বরে বলল, একটু জিরিয়ে নিতে দাও বেচারাকে। এত দূর রাস্তার ধকল। তবে হ্যাঁ আমাদের সময়টাও খুব কম। ফ্রেডরিক গৌতমের দিকে তাকাল।—তুমি ওঠ ভাই, এস আমার সঙ্গে।

গৌতম বুঝল এই বন্দী অবস্থায় এখন কিছু জোরজার বা বাক বিতণ্ডা করা বৃথা। তার চেয়ে এরা যা বলছে তাই করতে করতে অন্য কিছু একটা ভাবতে হবে।

অগত্যা সুবোধ বালকের মত সে উঠে দাঁড়াল।

ফ্রেডরিক ওকে নিয়ে সেই ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। ওদের পেছন পেছন পিস্তল ও ছুরি হাতে মার্কো ও রিচার্ডও চলল। ঘরের দোর গোড়ায় গিয়ে ফ্রেডরিক ওদের বাইরে থামিয়ে শুধু গৌতমকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকে গৌতম সামনে বিছানার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সত্যি তো একজন ভারতীয় মহিলা! কিন্তু এখানে ইনি কি ভাবে এলেন? গৌতম প্রশ্ন সূচক দৃষ্টি নিয়ে ফ্রেডরিকের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ। এর কথাই তোমায় বলছিলাম। ফ্রেডরিক গম্ভীর স্বরে বলল, এর জন্যই তোমাকে এখানে দোভাষীর কাজ করতে হবে বুঝতেই পারছ কাজটা খুব কঠিন নয়। কিন্তু গোপনীয়। হিন্দী জানা লোক ইয়োরোপে খুঁজলে হয়ত আমরা পেতাম। কিন্তু সবাইকে কি এখানে আনা যায়? এ বড় নিষিদ্ধ জায়গা। তোমাকে অনেক

বিশ্বাস করে এখানে আনা হয়েছে। কাজটা হাসিল করে দিতে পারলে তুমি অনেক পুরস্কার পাবে। চাইলে শুধু ইয়োরোপ কেন, সারা অ্যামেরিকাও তোমায় ঘুরিয়ে আনব। নাও এবার বোস এখানে। আমি বুড়িটাকে ডেকে যা জিজ্ঞেস করব, তুমি সেগুলো ওকে হিন্দীতে বুঝিয়ে দেবে। আবার ও যা উত্তর দেবে সেগুলো আমাকে ইংরেজীতে বলবে। ব্যাস এই আর কি।

সেই মহিলাটি অবশ্য এর মধ্যেই ওদের কথা-বার্তা শুনে জেগে উঠেছিল। বিছানায় রুগ্ন দেহটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে তখন সে দুজনের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

ফ্রেডরিক গৌতমকে এবার নির্দেশ দিল—নাও ওকে আগে বল তুমি ওর দেশের লোক। ওকে দেশে নিয়ে যেতেই এসেছ এখানে।

গৌতম পাশের চেয়ারে বসে একটা ঢোক গিলল। তারপর মহিলাটির দিকে তাকিয়ে হিন্দীতে বলল, আপনি মনে হচ্ছে খুব বিপদে পড়েছেন? ঘাবড়াবেন না, আমি ব্যাপারটা আগে বুঝে নিই। তারপর আপনাকে রক্ষা করার একটা উপায় বার করব।

ফ্রেডরিক এর এক বর্ণও বুঝতে পারল না। কিন্তু মহিলাটি গৌতমের মুখে নিজের ভাষা শুনে গদগদ হয়ে উঠল। ঠোঁটের ফাঁকে অতি কষ্টে একটা হাসি এনে জিজ্ঞেস করল, বাবা তুমি কে?

—আমি একজন ভারতীয় ট্যুরিস্ট। এ দেশে বেড়াতে এসেছি।

মহিলাটি তারপর আর কি বলতে যাচ্ছিল। ফ্রেডরিক থামিয়ে দিল—দাঁড়াও দাঁড়াও। গৌতমের দিকে ফিরে বলল, এবার ওকে বল ওই পেটিটা কোথায়। ও যদি বলে দেয় তাহলেই ওকে আমরা ছেড়ে দেব। তারপর ও তোমার সাথে দেশে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু ফ্রেডরিকের কথাটা শেষ হওয়া মাত্র হঠাৎ ঘরের বাইরে গুলির কয়েকটা আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে মার্কোর সাবধান বাণী শোনা গেল, ডন রাফায়ো!

ফ্রেডরিক চমকে উঠল। তড়িৎ গতিতে কোমর থেকে ওর পিস্তল বার করে বেরিয়ে গেল বাইরে। বাইরে তখন তুমুল কাণ্ড। এক

পাশে রিচার্ডের গুলি বিদ্ধ দেহ পড়ে, আর এক পাশে মার্কো দোতলায় যাবার সিঁড়ির তলায় বসে সামনের দরজা জানলার দিকে গুলি ছুঁড়তে ব্যস্ত। ফ্রেডরিকও নিমেষেই হাতে উদ্ধত পিস্তল নিয়ে একটা ডিভানের আড়ালে বসে পড়ল।

এণ্ডারসন পাঁচিলের তলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এরই অপেক্ষায় ছিল। যেই ও বাংলোর ভেতর থেকে শুনল গুলির আওয়াজ দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ছুটে গেল সামনে। রাফায়ো আর নিশাতকে সে একটু আগে বাংলোর ভেতরে ঢুকতে দেখেছে। ছুটতে ছুটতে বাড়িটার বাঁ দিকে এল সে। কাঁচের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ভেতরে পুরোপুরি রণাঙ্গন। সামনের বড় ঘরটায় রাফায়ো একটা বইয়ের তাকের আড়ালে পিস্তল উঁচিয়ে বসে। নিশাতকে ও দেখতে পেল না। কিন্তু ওদিকে ঘরের এক কোণে ডিভানের ওপারে আর একটা পিস্তল ওর নজরে পড়ল।

এণ্ডারসন পা টিপে টিপে এবার সারা বাংলোটাকে বাইরে থেকে চক্কর দিতে লাগল। গৌতমকে খুঁজছে সে। যদি ওর এখন দেখা পাওয়া যায়, তাহলে আর কথা নেই। তুটো দস্যুদল পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে ব্যস্ত। পালানোর এটাই সুযোগ।

ঠিক এই কথাই গৌতমও ভাবছিল তখন। ফ্রেডরিক ওদের ছেড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুলির আওয়াজ শুনে ও বুঝল কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে। গণ্ডগোলটা যে এদের মধ্যেই সেটাও স্পষ্ট। তখন সে এই ফাঁদ থেকে বেরোনোর অন্য পথ বার করার চেষ্টায় ছুটোছুটি করতে লাগল। কিন্তু এ ঘরের তুটো দরজা ছাড়া পেছনে শুধু তুটো জানলা। তাও বাইরে থেকে বন্ধ। পাশের দরজাটা লাগোয়া আর একটা ঘরের। কিন্তু সে ঘরে ঢুকেও গৌতম দেখল বাইরের দরজা জানলা সব বন্ধ। ঠেলা দিয়েও খুলল না।

এণ্ডারসন তখন ঘুরতে ঘুরতে এদিকে আসতেই কাঁচের জানলা দিয়ে গৌতমকে দেখতে পেল। দেখেই ছুটে এসে বাইরে থেকে

দরজাটা ঠেলা দিল। কিন্তু খুলতে পারল না। তারপর সে ঘরটাকে লক্ষ্য করে পর পর আরো কয়েকটা দরজা পেরিয়ে পেছন ধারে একটা খোলা বাথরুম আবিষ্কার করল। সেখান থেকে ভেতরে ঢুকে কয়েকটা ঘব পেরিয়ে গৌতমের কাছে চলে এল।

গৌতম হতবাক।

এণ্ডারসন হাতের ইশারায় ওকে সাবধান করে নিচু স্বরে বলল, চল আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। পালানোর এটাই সুযোগ।

—দাঁড়াও। গৌতম ফিসফিস করল, আর একজনকে সঙ্গে নিতে হব।

—কাকে ?

—আমার দেশের এক মহিলাকে। জানি না কেন এরা ওকে বন্দী করে রেখেছে।

তারপর দুজন মিলে খুব সাবধানে সেই মহিলাকে ঘর থেকে বার করে ধীর পায় বাংলোর বাইরে এল। এণ্ডারসন ওদের গাঢ় অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে বলল, গৌতন তুমি এঁকে নিয়ে গেটের দিকে চলে যাও। সাবধানে গেটটা খুলে বইরে গাড়িতে গিয়ে বস। আমি আসছি।

—কার গাড়ি ? গৌতম ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—তোমার সেই আরবী বন্ধু আর তার সঙ্গীর।

—ও বুঝেছি। কিন্তু তুমি গাড়ি চালাতে জান ?

—ভালই জানি। ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তোমরা গাড়িতে গিয়ে বস।

—আর তুমি ?

—আমি আসছি। এই গুণ্ডারা যাতে আমাদের পেছু না নিতে পারে তার ব্যবস্থা করে আসছি। বলেই এণ্ডারসন বাংলোর ডান দিকে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল। ওখানে একটা খোলা গ্যারেজ ছিল। তার নিচে দুটো গাড়ি। একটা জিপ আর একটা কার। এণ্ডারসন দুটোরই চাকার ভাল্‌ভগুলো খুলে হাওয়া বার করে

টায়ার গুলোকে অকেজো করে দিল। তারপর গ্যারেজ থেকে একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে বাংলোর সামনে গিয়ে ফ্রেডরিকের গাড়িটারও সেই একই অবস্থা করল। ওদিকে তখন বাংলোর ভেতর সাঁ সাঁ করে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। এগুারসন তিনটে গাড়িকে অকেজো করে এবার ছুটে গেল, লনে দাঁড়ান হেলিকপ্টারের দিকে।

ঠিক তখনই বাংলোর ভেতর থেকে জর্জ বেরিয়ে এল। জর্জ রাফায়ো আর ফ্রেডরিকের গুলি গোলার মধ্যে পড়ে এতক্ষণ ভেতরে হাঁস-ফাঁস করছিল। কিন্তু ওর কাছে বাংলোর অলি গলি সব জানা। এক ফাঁকে সেরকমই এক পথ দিয়ে বাইরে পালিয়ে এসে দেখল, এগুারসন হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এগুারসনকে ও অবশ্য চেনে না। তাই অন্ধকারে ওকে গৌতম ভেবেই ছুটে গেল সামনে। ওর সতর্ক পা।

এগুারসন সামনে থেকে কিছু টের পেল না। ও যেই হাতুড়িটা নিয়ে হেলিকপ্টারে উঠতে গেল, জর্জ পেছন থেকে অতর্কিতে এসে জাপটে ধরল ওকে। এগুারসন পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু পড়েই সামলে নিল। এক লাফে উঠে পেছন দিকে না তাকিয়ে ঘুরেই মারল একটা ঘুষি। ঘুষিটা মারার সঙ্গে সঙ্গে জর্জ বিদ্যুতের মত সরে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জর্জ পাকা লড়িয়ে। ওর সঙ্গে এগুারসন পারবে কি করে। কিন্তু তাহলেও সহজে ধরা দেবার ছেলে সে নয়। বেশ কিছুক্ষণ লনের ওপর ধস্তাধস্তি চলল ওদের।

এদিকে গৌতম তখন বাইরে রাফায়োর গাড়িতে বসে এগুারসনের এত দেরি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মহিলাটিকে বসতে বলে এবার সে গাড়ি থেকে নামল। তারপর এগুারসনের সন্ধানে গেটের কাছে গিয়ে উঁকি মারল ভেতরে। কিন্তু ওর কোন পাত্তা না পেয়ে আর একটু এগোতেই লনের দিক থেকে ধস্তা-ধস্তির আওয়াজটা শুনতে পেল। শুনেই সাবধান হয়ে গেল গৌতম। ফুলের কেয়ারীর ঝোঁপগুলো ঘেঁষে নিঃশব্দ পায়ে এগল। তারপর লনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাগানের অল্প আলোয়

দেখল একটা লোক এণ্ডারসনকে মাটিতে ফেলে ঘুষির পর ঘুষি চালাচ্ছে।

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে গৌতম পা টিপে টিপে লনের ভেতর ঢুকে পড়ল। একটু দূরে পড়েছিল এণ্ডারসনের আনা হাতুড়িটা। ওটা উঠিয়েই প্রচণ্ড জোরে জর্জের মাথা লক্ষ্য করে মারল এক ঘা।

জর্জ এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। পৈছন থেকে কে যে এই প্রবল আঘাতটা হানল, বোঝার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এণ্ডারসন জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

উৎকণ্ঠিত গৌতম ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় চোট লেগেছে তোমার?

—সেরকম মারাত্মক কিছু নয়। এণ্ডারসন চোয়ালে হাত ঘষতে ঘষতে গৌতমের কাছ থেকে হাতুড়িটা নিয়ে বলল, দাও বাকি কাজটা সেরে ফেলি। এক্ষুনি পালাতে হবে।

হাতুড়িটা নিয়ে এণ্ডারসন হেলিকপ্টারের ওপর উঠে পড়ল। যদিও হেলিকপ্টারের বিশেষ কিছু ও বোঝে না। তবু ওপরে উঠে চালকের আসনে বসে সেই হাতুড়ি দিয়ে সামনের সব যন্ত্রপাতি ভাঙ্গতে লাগল। গৌতম তখন নিচে দাঁড়িয়ে। চার পাশে ওর সতর্ক দৃষ্টি। এণ্ডারসন হেলিকপ্টারের দফা রফা করে নিচে নেমে আসতেই দুজন বাইরের গেটের দিকে পা বাড়াল।

গৌতম গাড়ির পেছনে মহিলার পাশে বসল। এণ্ডারসন বসল সামনে। বসেই গাড়িটা চালিয়ে দিল সে।

ইনসব্রুকের পথে যেতে যেতে মহিলাটি তার কাহিনী বলল। ও হচ্ছে ভারতবর্ষের ছত্রপুর স্টেটের মহারানীর খাস ঝি। মহারাজা আর মহারানী একমাস আগে ওকে নিয়ে ইয়োরোপে এসেছিলেন। ওঁরা প্রথমে নেমেছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে।

—তারপর? গৌতম সব শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করল।

—ওখানে আমরা একটা বড় হোটেলে উঠেছিলাম বাবা। ওই হোটেলে মহারাজা আর মহারানী থাকতেন একটা ফ্ল্যাটে। আমি

থাকতাম আলাদা ঘরে। সেখানে মহারাজার সঙ্গে রোজ দু'একজন লোক দেখা করতে আসত। একদিন রাতে মহারাজা হঠাৎ আমাদের নিয়ে একটি লোকের সঙ্গে ওই হোটেল ছেড়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন আমরা কোথায় যে যাচ্ছিলাম, জানি না। তবে অনেকক্ষণ যাবার পর একটা জায়গায় আমাদের সব কাগজ-পত্র পরীক্ষা করা হল।—তারপর আবার আমরা চলতে শুরু করলাম। সঙ্গের সেই লোকটি মহারাজাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ী পথ দিয়ে যেতে যেতে ওই লোকটা আমাদের হঠাৎ একটা নির্জন রাস্তায় ঢোকায়। ওটা জঙ্গলের পথ ছিল। সেই জঙ্গলে ঢুকতেই আমরা এক ভয়ঙ্কর ডাকাত দলের হাতে পড়লাম। ওই ডাকাত দলের সর্দার কে ছিল জান ?—এই লোকটা যে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এল।

—উইলিয়াম ?

—তা হবে। নাম টাম এদের আমি কিছু জানি না।

—তা এই লোকটার সঙ্গে কি ঐ লোকটার কোন যোগাযোগ ছিল, যে তোমার মহারাজাকে সেদিন রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গৌতম জিজ্ঞেস করল।

—না। মহিলাটি বড় বড় চোখে ঘাড় দুলিয়ে বলল, ও তো বরং এদের শত্রু ছিল। কারণ এই ডাকাতদের সঙ্গে ওই লোকটাই তখন খুব লড়াই করে। ওর কাছে একটা সাংঘাতিক পিস্তল ছিল, সেটা দিয়ে একজন ডাকাতকে সে মেরেও ফেলে।

—আর তোমার মহারাজা, তিনি কি করছিলেন তখন ?

—তিনি গাড়ি নিয়ে পালালেন। যেই লোকটা রাস্তায় নেমে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, তখন মহারাজা গাড়িটা চালিয়ে, দিলেন ছুট। ছুটতে ছুটতে অনেক দূর এসে তিনি গাড়িটাকে থামালেন এক জায়গায়। তারপর আমি দেখলাম মহারাজা মহারানীর কাছ থেকে একটা বাক্স নিয়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। জঙ্গল বলতে অবশ্য আমাদের দেশের মত ঘন বন নয়। তবে ঝোপ

ঝাড় আর পাহাড ছিল সেখানে। সেই ঝোঁপ ঝাড় থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তিনি তখন ওই বাক্সটা তাঁর হাতে আমি দেখিনি।

—তার মানে বাক্সটা উনি জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে এসেছিলেন তাই তো? কিন্তু বাক্সটাতে কি ছিল?

—তা আমি জানি না বাবা। তবে মূল্যবান কিছু ছিল নিশ্চয়। কারণ তারপরই মহারাজা গাডিতে উঠে আবাঁর দিশেহারার মত ছুটতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তা বলে ডাকাত দলের সঙ্গে কি পারা যায়। কিছুদূর যেতে না যেতেই জল্লাদরা আমাদের ধরে ফেলল।

—তারপর?

—তারপর যা ঘটবার তাই ঘটল। মহিলাটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল এবার, মহারাজা আর মহারানীকে মেরে ফেলল ওরা।

—মেরে ফেলল! বলতে বলতে গৌতম শিউরে উঠল।

—হ্যাঁ বাবা। ডাকাতরা মহারাজাকে পাকড়াও করে তখন জিজ্ঞেস করছিল বোধহয় বাক্সটা কোথায়। আমি তো কিছুই এদের কথাবার্তা বুঝি না। তবে দেখলাম মহারাজা মহারানী দুজনকেই ওরা কি সব জিজ্ঞেস করে আমাদের গাড়িটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। খুঁজে যখন কিছুই পেল না। তখন রেগে মেগে গুলি করে মেরে ফেলল ওঁদের। মেরে দেহ দুটোকে ঐ গাড়ির মধ্যে রেখেই গাড়িটাকে পাশের খাদে ফেলে দিল। তারপর ওরা আমাকে নিয়ে পড়ল। অবশ্য আমার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারল না। কারণ ওদের কথা আমি যেমন বুঝি না, তেমনি হিন্দী ছাড়া কিছু বলতেও পারি না।

—বুঝেছি তার মানে মহারাজা যে বাক্সটা জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে এসেছিলেন সেটা তুমি ওদের কাছে বল নি।

—হ্যাঁ। সে কথা এরা কিছু জানে না। আমি আকারে ইঙ্গিতেও সে কথা ওদের বলি নি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা গৌতমের কাছে পরিষ্কার হল। কায়রোর মহম্মদ জামিল তাহলে এই জন্যই ওকে ফ্রেডরিকের কাছে পাঠিয়ে ছিল? যাতে গৌতম দোভাষী হয়ে এই মহিলার কাছ থেকে ওই

বাক্সটার হদিশ জেনে ওদের জানায়। ওফ্ কি সাংঘাতিক পরিকল্পনা। এর জন্য এত ভনিতা এত ভদ্রতা। কিন্তু ইয়াসিন এর মধ্যে এল কেন? ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়ে এণ্ডারসনের কাছ থেকে জামিলের চিঠিটা ওর গাপ করার রহস্যটা তো বোঝা গেল না।

পেছনে ওদের কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখে এণ্ডারসন গৌতমকে এবার জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার কিছু জানতে পারলে?

—হ্যাঁ অনেক কিছু। গৌতম ওকে সংক্ষেপে সব ঘটনা বলল।

—তাহলে এখন পুলিসের কাছেই যাওয়া যাক। কি বল?

—নিশ্চয়ই।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। ইনসব্রুক শহরে ঢুকে এণ্ডারসন গাড়ির গতি কমিয়ে দুপাশে তাকাতে তাকাতে চলল। একজন লোক দেখলে জিজ্ঞেস করতে হবে এখানকার থানাটা কোথায়।

—তুমি কিন্তু সুন্দর গাড়ি চালাও এণ্ডারসন। গৌতম একটা হাই তুলে বলল। কথা বলতে বলতে এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি। এতটা পথ কত তাড়াতাড়ি চলে এলে।

—অষ্ট্রেলিয়াতে যেখানে আমি থাকি। সেখানে আমাদের বয়সে গাড়ি চালান না শিখলে খুব দুর্ভোগ হয়। সোনার খনি অঞ্চল। গাড়ি ছাড়া ওখানে আমরা খোঁড়া। বলতে বলতে ডান দিকের ফুটপাতে একজন পথচারিকে দেখে এণ্ডারসন গাড়িটা দাঁড় করাল।

তারপরের ঘটনা বিশেষ কিছু নেই। ইনসব্রুক থানা গৌতম ও এণ্ডারসনের কাছ থেকে সব বিশদ ভাবে শুনে সেই মুহূর্তে পিয়াজোর ভিলায় গিয়ে রাফায়ো, ফ্রেডরিক, মার্কো ও আহত রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করে আনল। ওরা ভিলা থেকে তখনও পালাতে পারেনি। তবে পালানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এণ্ডারসন ওদের যানবাহনের যা অবস্থা করে গিয়েছিল, এরপর আর ওরা পালাবে কি করে? তারপর গৌতম ও এণ্ডারসন সমেত ওদের প্রত্যেককে পরের দিনই ইটালিয়ান পুলিসের হাতে সোপর্দ করা হল। কারণ আসল ঘটনাটা ঘটে ছিল ইটালিতে। ফ্রেডরিক ও তার দল যেখানে ছত্রপুর স্টেটের

মহারাজা ও মহারানীকে খুন করে সে জায়গাটা ইটালির মিলান শহরের কাছাকাছি।

মিলান থানার অনুরোধে গৌতম ও এণ্ডারসনকে মোট তিনদিন থাকতে হয়েছিল সেখানে। ওই তিনদিন গৌতম ইটালিয়ান পুলিস ও সেই মহিলাটির মধ্যে দোভাষীর কাজ করে। ওরই সাহায্যে ইটালিয়ান পুলিস সেই মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে মিলানের'পাশের এক জঙ্গল থেকে মহারাজার সেই বাক্সটাকে উদ্ধার করে। ওই বাক্সটার মধ্যে ছিল পঞ্চাশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় চার কোটি টাকা মূল্যের হীরে জহরত। তারপর ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে মিলান পুলিস ওদের অনুরোধ করে যে ইটালিতে থাকা কালীন ওরা যেন প্রত্যেক শহর থেকে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

ভেনেসিয়া ৭

শেষ ঘটনাটা ঘটল ভেনিসে। মিলান থেকে ওরা প্রথমে ভিয়েনা গিয়ে ওদের রুকস্যাক দুটো উদ্ধার করে এল সোজা ভেনিস।

অর্থাৎ সেটা আরো পাঁচ দিন পরের কথা।

এড্রিয়াটিক সমুদ্রের মুখে ভেনিস এক স্বপ্নের শহর। জায়গাটা ওদের এত ভালো লেগেছিল যে ওরা ওখানে টানা তিনদিন কাটাল। ভেনিস শহরটা বলতে গেলে পুরোপুরি জলের ওপর। এখানে যানবাহন বলতে ভাপোরেতো আর গণ্ডোলা। দুটোই জলের বাহন। অনেক সময় এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি বা এ পাড়া থেকে ও পাড়া যেতে হলে সেই জল পেরোনোর জন্য হয় ব্রিজ বা গণ্ডোলায় চড়তে হয়। গণ্ডোলা বলতে জলের রাস্তার ট্যাক্সি আর ভাপোরেতো হচ্ছে জলের বাস। প্রতিটি ভাপেরেতো নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট রুটে চলে। রুট বলতে গ্রাণ্ড ক্যানেল ও তার শাখা প্রশাখা।

ভেনিসের শেষ দিনে ওরা ইয়ুথ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে সুন্দর শহরটাকে শেষ বারের মত ঘোরার জন্য ভাপোরেতো জেটিতে এসে

দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় গৌতম দেখল ইয়ুথ হোস্টেলের একজন কর্মচারী স্যুট-বুট পরা এক ভদ্রলোককে নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা কাছে আসতেই ভদ্রলোককে চিনতে পারল গৌতম। ইনি হচ্ছেন মিলানের সেই পুলিস অফিসার যার সঙ্গে তিন দিন ওকে সেই মহিলাটির জন্য দোভাষীর কাজ করতে হয়েছে।

—কি ব্যাপার, মিষ্টার রুডেলফো আপনি এখানে? গৌতম জেটির প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল।

মিষ্টার রুডেলফো অন্য ইটালিয়ান পুলিস অফিসারদের মতন নয়। তিনি ভালই ইংরেজী জানেন। হাসতে হাসতে বললেন, আমি তোমাদের দুজনকে রোম নিয়ে যেতে এসেছি।

—রোম? সে তো আমরা কালকেই যাচ্ছি।

—উহুঁ। এখন তোমাদের যেতে হবে স্টেট গেষ্ট হয়ে। এই দেখ তোমাদের জন্য প্লেনের দুটো ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট নিয়ে এসেছি। রোমে ইটালি সরকারের পুলিস চীফ তোমাদেব চাক্ষুষ দেখতে চেয়েছেন।

—ওরে বাবা, একেবারে চীফ! এণ্ডারসন ভুরু কুঁচকে বলল, কেন? আমরা কি করলাম আবার?

—ইটালিতে আন্তর্জাতিক কুখ্যাত কয়েকজন দস্যুদের ধরিয়ে দেবার জন্য তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারটা আমাদের খোদ কর্তা নিজের হাতে তোমাদের দেবেন।

গৌতম আমতা আমতা করে বলল, আমাদের যেতেই হবে?

—আলবাৎ। পুলিস চীফের হুকুম। নড়চড় করার কোন উপায় নেই। মিষ্টার রুডেলফো হাসতে হাসতে বললেন, কেন, তোমাদের কি ঘোরা বাকি আছে এখানে?

—নিশ্চয়ই। এই সুন্দর শহরটাকে আমরা শেষ বারের মত একবার ঘুরে দেখতে চাই। গৌতম ক্যানেলের দিকে তাকিয়ে বলল।

ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকালেন—ঠিক আছে চল, প্লেন ছাড়তে এখনও দেরি আছে। ততক্ষণ ঘুরে আসি। বলেই তিনি একটা গণ্ডোলাকে ইশারায় ডাকলেন।

গণ্ডোলাটা কাছে আসতেই তিনজন উঠে বসল ওটাতে। তারপর ওরা তর তর করে ভেসে চলল শহর পরিক্রমা করতে।

কিছুদূর গিয়ে এণ্ডারসন জিজ্ঞেস করল। মিষ্টার রুডেলফো, আপনার অনুসন্ধান কি শেষ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। তিনি গণ্ডোলার চেয়ারে গা এলিয়ে বললেন, তোমাদের জন্য হয়ত ভারত সরকারের তরফ থেকেও একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। তার কারণ ওই মহারাজা ভারত সরকারকে ফাঁকি দিয়ে অতগুলো হীরে জহরত জুরিখে নিয়ে এসেছিলেন।

—কেন? গৌতমের প্রশ্ন।

—ওগুলো ওখানে বিক্রি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। বিক্রি করে টাকাটা বে-আইনি ভাবে সুইস ব্যাঙ্কে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি।

—কেন, ব্যাঙ্কে টাকা রাখা কি বে-আইনি? জিজ্ঞেস করল এণ্ডারসন।

—হ্যাঁ। বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা রাখা ভারতীয়দের পক্ষে বে-আইনি। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন। তাছাড়া ভারতীয় টাকা বিদেশে গ্রহণ করাও হয় না। সেজন্যই মহারাজা পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের হীরে জহরত লুকিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর হিজ-হাইনেস কুখ্যাত রাফায়েলার দলের এক দস্যুর খপ্পরে পড়েন। ওই দস্যুটাই মহারাজাকে বলে তিনি যদি হীরে জহরতগুলো ইটালিতে বিক্রি করেন, তাহলে খুব ভাল দর পাবেন। তাই বেশী দামের লোভেই সেদিন তিনি ইটালিতে এসেছিলেন। মিলানের কাছে এসে দস্যুটা যখন সব হীরে জহরত লুট করার জন্য মহারাজাকে ওদের এক আড্ডার দিকে নিয়ে যায় তখন ফ্রেডরিক তার দলবল নিয়ে ওর ওপর হামলা করে। ফ্রেডরিক মহারাজার ঐ বহুমূল্য সম্পদের খবর আগেই পেয়েছিল। তারপরের সব ব্যাপার তো জানোই তোমরা। ফ্রেডরিক হীরে জহরত না পেয়ে মহিলাটিকে বন্দী করে রাখে। কিন্তু মুশকিল হল মহিলাটি হিন্দী ছাড়া আর কিছুই জানে না। সেজন্যই ওদের খুব অসুবিধে হচ্ছিল। মহিলাটির কাছ থেকে ওরা কিছুতেই জানতে পারল না যে হীরে

জহরতগুলো কোথায়। তখন ফ্রেডরিক ওদের দলের একমাত্র হিন্দী জানা লোক জামিলকে কায়রো থেকে ডেকে পাঠায়। এই ব্যাপারটা রাফায়ো তার স্পাই মারফত জানতে পারে। রাফায়ো এমনিতেই ফ্রেডরিকের ওপর বাটপাড়ি করার জন্য ভীষণ চটে ছিল। কিন্তু যখন ও জানল ফ্রেডরিক হীরে জহরতগুলো এখনও পায়নি কিন্তু পাওয়ার চেষ্টায় মহারানীর ঝিকে বন্দী করে রেখেছে, তখন সে কায়রো ছুটে আসে। কারণ ফ্রেডরিক যে তখন কোথায় সেটা ওর জানা ছিল না। কায়রোয় এসে জামিলকে অনুসরণ করে ফ্রেডরিককে একেবারে সেই মহিলা সমেত হাতে নাতে ধরাই ওর উদ্দেশ্য ছিল। যাতে ফ্রেডরিককে সে উচিত শিক্ষা দিতে পারে ও তার সাথে সেই বহু মূল্য হীরে জহরতগুলোও গাপ করতে পারে। এজন্যই জামিল কায়রো থেকে নিজে না এসে গাউতামকে ফ্রেডরিকের কাছে পাঠাল। কিন্তু রাফায়ো ওর চেয়েও বেশী চালাক। ব্যাপারটা আঁচ করে সে গাউতামকেই অনুসরণ করতে শুরু করল। তাহলেও রাফায়োর কপাল বড় মন্দ। তোমাদের মত দুটি দামাল ছেলের পাল্লায় যে সে পড়বে ও কি জানত? বলে হো হো করে হেসে উঠলেন মিষ্টার রুডেলফো।

এণ্ডারসনও হাসল।

কিন্তু গৌতম তখন একমনে ভেনিসের শোভা দেখতে ব্যস্ত। ইটালি সরকার কি পুরস্কার দেবে ওদের বা ভারত সরকার কিছু দেবে কি দেবে না, সে সব ভাববার ওর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ও তখন ওর রোমাঞ্চকর আনন্দ আহরণে ব্যস্ত। যে আনন্দের আকর্ষণ ওকে বারবার দূর থেকে দূরে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনে।

এটাই ওর কাছে সব চেয়ে বড় পুরস্কার।